সন্ত্রাসবাদ ও শহীদ ভগৎ সিং

সন্তোষকুমার অধিকারী

শ ঙ্খ প্র কা শ ন

প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ়, ১৩৮৫

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক ঃ মনোরঞ্জন মজুমদার, শঙ্খ প্রকাশন, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭০০০০৯। মুদ্রাকর ঃ দুলালচন্দ্র ভুঞ্যা, সুদীপ প্রিণ্টার্স, ৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলিকাতা—৭০০০১২

উৎসর্গ

শ্রীকিরণচন্দ্র দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের কথা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুপ্তবিপ্লবের ধারা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচেষ্টার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ১৮৭৯/৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত বাসুদেব ফাদকের ডায়েরি যেমন এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল মুক্তিসন্ধানী ভারতবাসীর মনে, ঠিক অনুরূপ কিম্বা আরও বেশী আলোড়ন জাগিয়েছিল ক্ষুদিরাম-এর ফাঁসি। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে তিলক এবং পরাঞ্জপের রাজনৈতিক রচনা ও বক্তৃতা, এবং বাংলায় অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্রের পূর্ণস্বাধীনতার দাবি দেশের মানসিকতায় যে বেদনা ও উৎকণ্ঠার ঢেউ তুলেছিল, তারই ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছিল যতীন মুখার্জী, রাসবিহারী বসু, সাভারকর ও হরদয়ালের মত নেতৃত্ব, ভারতের মাটি থেকে অনধিকার প্রবেশকারী শোষক ও নিপীড়ক ব্রিটিশ শাসনের মূলকে উন্মূলিত করে ফেলে দিতে যাঁরা জীবনপণ করেছিলেন।

অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের যে ধারা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রবাহিত করেছিল, তার প্রভাব যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া এই বিরাট ও বিস্তৃত ভূখণ্ডের গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের চেতনাকে প্রবাহিত করতে পারার কৃতিত্বও গান্ধীর। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্ ধসিয়ে দিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবের স্রোত। নীতি ও বিবেক নিয়ে বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির কোন মাথা ব্যথা ছিল না। "The British felt that they had little to fear from Gandhi himself."* কিন্তু সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা যার উৎস নেমেছিল ফাদকে, অরবিন্দ এবং তিলক থেকে, এবং যার প্রবাহে মিশেছিল কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কামা, রামচন্দ্র, বরকতুল্লা থেকে শুরু করে বাঘা যতীন, সূর্য সেন, ভগৎ সিং এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত অদম্য ব্যক্তিত্বের অপ্রতিরোধ্য স্রোত, সেই প্রবল এবং দুর্বার স্রোতের ধারাতেই যে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেল ব্রিটিশ শাসনের মর্মর প্রাসাদ, একথা স্বীকার করতে অন্ততঃ দ্বিধা বোধ করেননি ব্রিটিশ সাংবাদিকেরা। "If Subhas and his men had been on the right side, then Indians in the Indian Army must have been on the wrong side. It slowly dawned upon the Government of India that the backbone of British rule, the Indian army, might no longer be trustworthy."—Michael Edwardes.

"There can thus be little doubt the Indian National Army ……hastened the end of British rule in India"—Hugh Toye.

মুক্তিসংগ্রামের এই প্রবল এবং বিশিষ্ট ধারাটির অনুসরণ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে, বৈপ্লবিক কর্মধারায়, দেশাত্মবোধের প্রেরণায় এবং দুঃসাহসিক আত্মদানের সাধনায় পাঞ্জাবকে বাংলাদেশই দীক্ষা দিয়ে এসেছে। ১৯০২ সালে কলকাতায় ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের নেতৃত্বে যখন গুপ্তসমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় তখন স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি এবং চিন্তাধারা প্রসারের কাজে অগ্রণী হয়ে এসেছিলেন দুই নারী—ভগিনী নিবেদিতা ও সরলা দেবী। ১৯০৫ সালে লালা লাজপত রায় কলকাতায় এসে নিবেদিতার সংগে দেখা করেন এবং সরলা দেবীর কাছেও যান। "When Lajpat Rai called on her on the first day she was not at home and yet Lalaji waited for her return for two hours. He succeeded in seeing her next day."
—Dr. B. B. Majumder : Militant Nationalisan in india.

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবে যান ১৯০৬ সালে। উদ্দেশ্য: পাঞ্জাবে বিপ্লবের বীজবপন। তিনি সর্দার কিষণ সিং ও সর্দার অজিত সিংকে স্বাদেশিকতার দীক্ষা দেন। ন্যাশনাল আর্কাইভে রক্ষিত পুলিস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, অজিত সিং ও সরলা দেবীর দেশাত্মবোধক ও উত্তেজক কিছু রচনা লালাজীর পাঞ্জাবী প্রেস থেকে ছাপা হয়ে সাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। †

এর পরের যুগে আমরা পাই রাসবিহারী বসুকে, যাঁর নেতৃত্বে সমগ্র উত্তর ভারতে একটি বৈপ্লবিক সংস্থার সৃষ্টি হয়। সেদিন রাসবিহারী বসুর সংগে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের ভাই বালমুকুন্দ, আমীরচাঁদ ও অবধবিহারীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালে ঘদর বিপ্লবের নেতাও ছিলেন রাসবিহারী বসু। সেদিন তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কর্তার সিং সরোবার নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে পাঞ্জাবের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে।

এই কর্তার সিং সরোবাই ভগৎ সিং-এর হীরো। তবু ভগৎ সিংকে ছুটে আসতে হয়েছে কলকাতায়। কলকাতায় এসে তিনি আশীর্বাদ চাইতে গেছেন নিরালম্ব স্বামীর (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে। রাজনৈতিক চেতনায় ভগৎকে যিনি অনুপ্রাণিত করেছেন তিনিও এই বাংলার মানুষ শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। শচীন সান্যালই রাসবিহারী বসুর পর উত্তর ভারতের নেতা। ভগৎ সিং-এর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থেকেছেন বর্ধমানের ছেলে বটুকেশ্বর ও কলকাতার যতীন দাস। দধীচির মত আপন অস্থিতে বজ্রানল জ্বালিয়ে গেছেন যিনি, তিনিই যতীন দাস। শেষ মুহূর্তে স্বাধীনতার তরুমূলে রক্তদানের যে প্রেরণা অনুভব করেছিলেন ভগৎ সিং, তা এই যতীন দাসের দান।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের উজ্জ্বলতম একটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন বা হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের কর্মধারা। এই অধ্যায়ের দু'টি ধারায় চট্টগ্রাম এবং পাঞ্জাব ;

—চট্টগ্রামের নেতা সূর্য সেন এবং পাঞ্জাবের আন্দোলনের মধ্যমণি ভগৎ সিং। দু'জনেই ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদান করেন। ভগৎ সিং মৃত্যুবরণ করেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। উত্তেজনা বা আবেগে নয় 'বিপ্লব'কে তিনি অনুভব করেছিলেন এক গভীরতর অর্থে। তাঁর এই অনুভব অত্যন্ত পরিণত ও আধুনিক ছিল বলেই সন্ত্রাসবাদ নয়, দেশের জন্য আত্মদানের প্রেরণাকে তিনি সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

সর্দার ভগৎ সিং এবং তাঁর সহযোগী বিপ্লবীদের জীবনী অবলম্বন করে স্বাধীনতার সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়কে গ্রন্থিত করতে চেয়েছি। যা কিছু তথ্য নানাভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা' ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই সব তথ্য—সরকারী মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত মালমসলা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সমসাময়িক পত্রপত্রিকার কাটিং প্রভৃতি যিনি নির্দ্বিধায় আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীকিরণচন্দ্র দাস, শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের অনুজ। শুধু তথ্য সংগ্রহ দিয়ে নয়, তিনি নানাভাবে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থরচনার কাজে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

ভগৎ সিং-এর ভাগিনেয় ও শ্রীমতী অমর কাউর-এর পুত্র জগমোহন সিং কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি আমায় এনে দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। তাছাড়া যাঁদের কাছে উৎসাহ ও উপদেশ পেয়েছি তাদের মধ্যে বিপ্লবী বিজয়কুমার সিংহ (বর্তমানে হায়দরাবাদ নিবাসী) এবং কুলবীর সিং (ভগৎ সিং-এর অনুজ)'এর নাম উল্লেখযোগ্য।

৮১, রাজা বসন্ত রায় রোড
কলিকাতা—২৯
১লা আষাঢ়, ১৯৭৮

সন্তোষকুমার অধিকারী

* The Last years of British India, by Michael Edwardes, Page 47.

† Home/Pol., August 1907, Nos. 243-250

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯০৭ সাল নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই তাঁর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ প্রকাশ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করলেন। তিনি লিখলেন—ব্রিটিশশাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হবে না। অরবিন্দের নির্দেশে ১৯০৭ সালেই বারীণ ঘোষ মাণিকতলায় মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়িতে গুপ্ত সমিতির আড্ডা স্থাপন করলেন এবং উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাসের সহায়তায় বোমা তৈরী করলেন। অরবিন্দের বক্তৃতা ও রচনা শুধু বাংলায় নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও যুবসমাজের মনে জাতীয়তাবাদের প্রবল প্রেরণা এনে দিলো। নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদী যুবসমাজ স্বাধীনতা ও স্বরাজের দাবিকে সোচ্চার কণ্ঠে উপস্থাপিত করলো।

'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম'-এর বিপ্লবাত্মক আদর্শের বাণী উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবের শিক্ষিত জনচিত্তে বিদ্রোহের ভাবধারা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল, তার কিছুটা পরিচয় আমরা পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্নর ডেনজিল ইবেটসনের লেখা রিপোর্ট থেকে পাই। ১৯০৫ সালের প্রথমার্ধে পাঞ্জাবের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইবেটসন লিখেছিলেন—

"…the new ideas were confined to the educated classes and among them in thc main to the pleaders, clerks and students."

(নতুন চিন্তাধারার প্রসার প্রধানতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতর এবং তার মধ্যেও উকীল, কেরানী ও ছাত্রসমাজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল।)

পাঞ্জাবের সর্বত্র ইংরেজবিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে গণ-আন্দোলন যে দানা বেঁধে উঠছে, তার উল্লেখ করে তিনি লেখেন—"রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট ও লায়ালপুরে ইংরেজবিরোধী প্রচার কাজ প্রকাশ্যে এবং প্রবলভাবে করা হচ্ছে। প্রদেশের রাজধানী লাহোরে এই প্রচার মারাত্মক রূপ নিয়েছে এবং প্রচণ্ড অশান্তির সৃষ্টি করেছে।"[১]

(In Lahore, the capital of the province, the propaganda is virulent and has resulted in a more or less general state of serious unrest.)

সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষের যে অগ্নি পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন ধরে ধোঁয়াচ্ছিল, হঠাৎ দাবানলের মত তা জ্বলে উঠলো, যখন সরকার প্রবর্তিত জলকর ও ঔপনিবেশিক করের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানালেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

১৯০৬ সালেই পাঞ্জাবে বিপ্লব আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন সর্দার অজিত সিং। বড় ভাই কিষণ সিং, ছোট ভাই শরণ সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদ, ঘসিতা রাম প্রমুখের সহযোগিতায় অজিত সিং 'ভারতমাতা সংঘে'র প্রতিষ্ঠা করেন।[২] বাংলা থেকে বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময়ে পাঞ্জাবে এসে পৌঁছেছিলেন এবং কিষণ সিং-এর ওপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল।[৩] বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'যুগান্তর' ও অন্যান্য প্রচার পত্রিকাও গুপ্তভাবে লাহোরে এসে পৌঁছোচ্ছিল। স্যার ডেনজিল ইবেটসন তাঁর নোটে উল্লেখ করেছেন যে, চেনাব ক্যানেল কলোনি ও বারিদোয়াবের গ্রামগুলিতে ক্যানেল করকে উপলক্ষ্য করে প্রবল অসন্তোষ ও বিক্ষোভ এবং ইংরেজবিদ্বেষ মাথা নাড়া দিয়েছে। এই বিক্ষোভকে চরম আন্দোলনে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে।

প্রকাশ্য আন্দোলনে সেদিন সর্দার অজিত সিং ও কিষণ সিং-এর পাশে এসে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি পাঞ্জাবের সর্বজনমান্য নেতা লালা লাজপত রায়।

ইংলিশম্যান পত্রিকার বিরুদ্ধে লালাজীর অভিযোগক্রমে যে মানহানির মামলার শুরু হয়, তার রায়ে বিচারপতি ফেচার এই অবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন—[৪]

১৯০৭ সালে পাঞ্জাব আইন সভায় ক্যানেল কলোনি সংক্রান্ত বিলটি উপস্থাপিত করা হয়। বিলের ধারাগুলি পাঞ্জাবের কয়েক শ্রেণীর লোকের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, গভর্নমেণ্ট উপনিবেশবাসীদের কাছে ইতিপূর্বে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই বিলে সেইসব প্রতিশ্রুতিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। বিলের ধারাগুলি উপনিবেশবাসীদের স্বার্থের বিরোধী। এই উপনিবেশবাসীদের বেশীর ভাগই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। এও দেখা যায় যে, ভারত

সরকারের পাঞ্জাব বাহিনীর সিপাইরা কৃষক সমাজের মধ্যে থেকেই এসেছে।

দেখা যাচ্ছে যে, এই বিলের বিরুদ্ধে চারদিকে আন্দোলন শুরু হয় এবং বাদী (লালা লাজপত রায়) নিজেও এই আন্দোলনে যুক্ত হন। এই সময়ে পাঞ্জাবে অজিত সিং নামের এক ব্যক্তি এই আন্দোলনে অগ্রগণ্য ভূমিকা নেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এই অজিত সিংকে লালা লাজপত রায়ের লেফট্‌ন্যাণ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু লালা লাজপত রায় এই মন্তব্যে আপত্তি করে অজিত সিং-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অস্বীকার করেছেন। অবশ্য বাদী স্বীকার করেছেন যে, কিষণ সিং-এর মাধ্যমে অজিত সিং-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল।

মি. ফেল্চার ২৭শে মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি বিক্ষোভসভার উল্লেখ করে বলেন যে, "বাদী (অর্থাৎ লালা লাজপত রায়) এই সভায় প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে বলবার জন্য আমন্ত্রিত হন এবং তাঁর ভাষণ দান করেন। এই সভায় অজিত সিংও বক্তৃতা দেন। বাদী (লাজপত রায়) বলেছেন, অজিত সিং তাঁর বক্তৃতায় কড়া কড়া শব্দ ব্যবহার করেছেন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি (বাদী) মনে করেন না যে, ওই সব ভাষা আইনতঃ আপত্তিজনক।"

রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরেই ব্রিটিশ-বিরোধী এই আন্দোলনের ধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ৬ই জুন তারিখে কমন্স সভায় বিবৃতিদানকালে লর্ড মোরলে (Lord Morley) বললেন যে, ১লা মার্চ থেকে ১লা মে—এই দু'মাসের মধ্যে পাঞ্জাবে বিক্ষোভকারীরা মোট আঠাশটি সভার অনুষ্ঠান করেছে। এর মধ্যে পাঁচটি কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থে এবং তেইশটি রাজনৈতিক কারণে অনুষ্ঠিত।[৫]

গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলেন—[৬]

"We cannot afford to forget the events of the early spring, the riots at Lahore and gratuitious insults to Europeans, the Pindi riots, the serious view of the Lieutenant Governor of the Punjab on the state of his province, the consequent arrest of Lajpat Rai and Ajit Singh and the promulgation of the ordinance, and,

contemporaneously with all this a daily story from Eastern Bengal of assault, of looting, of boycotting and general lawlessness, encouraged by agitators, who with an utter disregard for consequences, no-matter how terrible, have by public addresses, by seditious newspapers, by seditious leaf-lets, by itinerant secret agents, lost no opportunity of inflaming the worst passions of racial feeling."

(বছরের প্রথম দিকের ঘটনাগুলিকে আমরা ভুলে যেতে পারি না। এইসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে লাহোরের দাঙ্গা, ইউরোপীয়দের অহেতুক অপমান, রাওয়ালপিণ্ডির দাঙ্গা, পাঞ্জাবের অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক শাসনকর্তার গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রভৃতি। এর ফলে লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এইসব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যেক দিন খুন, লুট, বয়কট ও আইনভঙ্গের এক-একটি কাহিনী। এইসব উত্তেজনামূলক কাজের যারা প্ররোচক, তারা কাজের ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। ভয়াবহ যা কিছুই ঘটুক, তাতে উদাসীন থেকে এরা বক্তৃতা, আপত্তিকর সংবাদ প্রচার, পুস্তিকা ও গোপন সংগঠনের দ্বারা মানুষের মনে বিদ্বেষের চরম মনোভাবকে উস্কিয়ে দিতে সদা তৎপর।)

১৯০৭ সালের ১৬ই এপ্রিলে ঘটে লাহোর দাঙ্গা। গ্রেপ্তার করা হয় 'ভারতমাতা সংঘে'র সম্পাদক নন্দকিশোরকে। অজিত সিং-এর বড় ভাই সর্দার কিষণ সিং পলাতক হন। নেপাল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে কিষণ সিংকে গ্রেপ্তার করে লাহোরে আনা হয়। কিষণ সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ফিলিপসকে প্রহার করেছেন। ডিসেম্বর মাসে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্রেশার-এর কোর্টে বিচার হয় এবং কিষণ সিং দু' বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২রা মে তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে উত্তেজিত জনতা এক প্রচণ্ড গোলমালের সৃষ্টি করে। সরকারের মতে, সর্দার অজিত সিং'ই জনতাকে বক্তৃতাদির দ্বারা উত্তেজিত করেন। ভাইসরয় তাঁর নোটে লিখেছিলেন—

—"He was convinced that the head and centre of

the movement was Lajpat Rai, and his prominent agent in disseminating sedition was Ajit Singh···"[৭]

(তিনি দৃঢ়নিশ্চিত যে, এই আন্দোলনের মস্তিক হচ্ছে লাজপত রায় এবং রাজদ্রোহ প্রচারে তার উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি হলো অজিত সিং।)

ভাইসরয়ের নোটের ভিত্তি ছিল প্রাদেশিক গভর্নর ইবেটসনের নোট। ইবেটসন স্পষ্টই বলেছিলেন—

"Some of the leaders looked to driving the British out of the country ··"[৮]

(নেতাদের মধ্যে কারও কারও উদ্দেশ্য ব্রিটিশকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া—)

পুলিস অফিসার মি ফেণ্টন তার একটি চিঠিতে লেখেন—

"I hear that Ajit Singh, a lecturer preached to a large concourse of zamindars on Sunday that they should not pay the enhanced revenue and should resist its collect.

"It is a question whether there is not sufficient evidence against Ajit Singh for a prosecution under Sec. 143 of Indian Penal Code."

("আমি শুনেছি, অজিত সিং নামের এক অধ্যাপক জমিদারদের এক বিরাট সমাবেশে বলেছে যে, তারা যেন বর্ধিত হারে ট্যাক্স না দেয় এবং এই ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টাকে প্রতিহত করে।

"জিজ্ঞাস্য এই যে, অজিত সিংকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারায় অভিযুক্ত করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে কিনা।")

অজিত সিং-এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের অভিযোগ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হতে থাকে। মাত্র তেইশ বছর যার বয়েস, সেই তরুণ যুবক একটা ঘূর্ণি-ঝড়ের মত ফিরোজপুর, লায়ালপুর ও জলন্ধরে, লাহোরে ও রাওয়ালপিণ্ডিতে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ও ইংরেজ-বিদ্বেষের ইন্ধন ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন। অথচ আইনের আওতায় আনবার মত যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করাও গেল না। শেষ পর্যন্ত গভর্নর গণ-আন্দোলনের দুই নেতাকে ১৮১৮ সালের কুখ্যাত তিন নম্বর রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ৮ই মে তারিখে পার্লামেণ্টে

একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব মি. মোরলে জানালেন, তিনি ভাইসরয়ের কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়ে জেনেছেন যে, পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ডেনজিল ইবেটসন অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও যোগ্য শাসক। তিনি আন্দোলনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দু'জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে অন্য কোন প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ভাইসরয়ের অনুমতি চেয়েছেন। ভারত সরকারও স্বীকার করেছেন যে, অবিলম্বে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও জারি করা হয়েছে।[৯]

মে মাসের ৯ই তারিখে লাহোরে লালা লাজপত রায়কে এবং ৩রা জুন ফিরোজপুরে অজিত সিংকে পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বার্মার মান্দালয় জেলে নির্বাসনে পাঠায়।

লালাজী ও অজিত সিং-এর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে শুধু লাহোরে নয়, পাঞ্জাবের সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১০ই ও ১১ই মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদে জানা যায় যে, বিক্ষোভ দমন করার জন্য লাহোরের রাস্তায় সৈন্য নামাতে হয়।

প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে পার্লামেণ্টেও। বিরোধী পক্ষের সভ্যরা ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন প্রয়োগের যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করেন। এই রেগুলেশনের আওতায় ব্রিটিশ উপনিবেশের নিরাপত্তার জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়ে আটক রাখার অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল গভর্নমেণ্টকে। লর্ড মোরলের উক্তিতে সভ্যরা সন্তুষ্ট হন না। ১৭ই নভেম্বর দু'জনকেই মুক্ত করা হয়।

পাঞ্জাবের এই পরিবেশে ১৯০৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখটি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠলো আর একটি কারণে। লায়ালপুর জেলার বঙ্গা-গ্রামে সকাল ন'টায় সর্দার কিষণ সিং-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করলো একটি শিশু—পরবর্তীকালে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যাকে রাজকুমার বলে অভিহিত করা হয়েছে। (A Prince among the Indian revolutionaries)

ভগৎ সিং-এর পারিবারিক ইতিহাস লক্ষ্য করলে মনে হবে, সে ইতিহাস যেন এক মহাবিপ্লবীর জন্মমুহূর্তের প্রস্তুতিপর্ব। পিতামহ অর্জন সিং জলন্ধর জেলার খটকার-কালন গ্রামের অধিবাসী।[১০] জীবিকা চাষ আবাদ, কিন্তু অর্জন সিং পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন। আর্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত

থেকে। তিনি সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা ও জনহিতৈষণার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। অর্জন সিং গ্রামবাসীদের মধ্যে কাজ করেছেন এবং এক সময়ে (১৮৯৩ খৃঃ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। জলন্ধর থেকে লায়ালপুরে শিশুপুত্রদের নিয়ে অর্জন সিং চলে আসেন এবং বংগাগ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।

অর্জন সিং-এর তিন পুত্রের মধ্যে বড় কিষণ সিং'ই ভগৎ সিং-এর পিতা। পিতা অর্জন সিং-এর কাছে কিষণ সিং এক সংস্কারমুক্ত মনের প্রভাব পেলেন, কিন্তু জাতীয়তার বোধ ও দেশপ্রেম লাভ করলেন শিক্ষক সুন্দর দাসের কাছে। এই সুন্দর দাস প্রেরণা দিয়েছিলেন স্বাজাত্যবোধের—যে প্রেরণায় কিষণ সিং ও তাঁর ভাই অজিত সিং পাঞ্জাবের চাষীদের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করে ব্রিটিশ শাসনকে অগ্রাহ্য করার শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। পিতার মত কিষণ সিংও সমাজসেবায় নিজেকে মগ্ন করে-ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের সহযোগিতায় তিনি একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। সমাজসেবার কাজ থেকে রাজনীতিতে সরে এলেন তিনি ১৯০৬ সালে, 'ভারতমাতা সংঘে'র মাধ্যমে। পাঞ্জাবের কৃষকদের ওপর থেকে অবিচার ও শোষণ দূর করার জন্য অজিত সিং-এর সংগে তিনিও আন্দোলন করেছেন এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে অশিক্ষিত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে তুলেছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংগেও তার যোগ নিবিড় ও সক্রিয়।

কিষণ সিং একদিকে যেমন বারিদোয়াবের কৃষক সংগঠনের কাজ করেছেন, জাতীয় কংগ্রেসের জন্য সহানুভূতি ও আনুকূল্য জানিয়েছেন, অন্যদিকে পাঞ্জাবের গুপ্ত, সশস্ত্র বিপ্লবের কাজেও সহায়তা করেছেন। গদর বিপ্লবের অন্যতম নায়ক কর্তার সিং সরোবাও তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথি থেকে জানা যায় যে, কিষণ সিং সরোবাকে একবার এক হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছিলেন।

আর ভগৎ সিং-এর কাকা অজিত সিং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চোখে এক দুর্ধর্ষ নায়ক। লাহোরের D. A. V. কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অজিত সিং প্রথম জীবনে শিক্ষক ছিলেন। পাঞ্জাবে গুপ্ত আন্দোলন ও চরমপন্থার প্রবর্তক হিসেবে অজিত সিং-এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বারিদোয়াব ও চেনাব ক্যানেলের উপনিবেশগুলিতে সরকার প্রবর্তিত নূতন করনীতির প্রতিবাদে তিনি কৃষকদের আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই উদ্দেশ্যে

সৈয়দ হায়দার রেজার সংগে তিনি 'ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টস' অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন। বৈপ্লবিক সংস্থা 'ভারতমাতা সংঘ' ও পত্রিকা 'পেশোয়া'র প্রতিষ্ঠাও অজিত সিং'ই করেন। তাঁর দুই ভাই—কিষণ সিং ও শবণ সিং তাঁর 'ভারতমাতা সংঘে' যোগ দেন। এই সংঘের সংগে আর যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কর্তার সিং, মেহতা আনন্দকিশোর, ঘসিতা রাম ও জিয়াউল হকের নাম উল্লেখ্য। এই অজিত সিং পাঞ্জাব সরকারের কাছে ভীতিজনক হয়ে উঠেছিলেন। একটি সরকারী নোটে[১১] তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়—

"Ajit Singh during the last two months has held a constant series of meetings and has openly advocated sedition. He clearly ought to be stopped at once."

অর্থাৎ—গত দুই মাসে অজিত সিং ক্রমান্বয়ে সভাসমিতি করেছেন এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহাত্মক বাণী প্রচার করেছেন। তাকে অবিলম্বে থামিয়ে দেওয়া দরকার। ওই একই নোটে বলা হয়—

"Agitator Ajit Singh and others have urged the people to rise, attack the English and be free."

"আন্দোলনকারী অজিত সিং ও অন্যান্যরা সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহ করতে এবং ইংরেজদের আক্রমণ করে মুক্তি অর্জন করতে প্রবোচনা জুগিয়েছেন।"

অজিত সিং সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে লোক ক্ষেপিয়ে দিতেন। তাঁর বক্তৃতায় উত্তেজিত জনতা লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে দাংগা বাধিয়েছে বলে সরকারী নথিতে মন্তব্য করা হয়েছে।

অজিত সিং নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। তাঁকে দমিয়ে রাখবার ক্ষমতা সরকারী দপ্তরের হাতে ছিল না। আন্দোলনকে নষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ১৯০৭ সালের ৩রা জুন তাঁকে গ্রেপ্তার করে সুদূর মান্দালয়ে চালান করে। কিছুদিন পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং অনেক প্রলোভন তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়। কিন্তু অদম্য অজিত সিং প্রলোভন ও নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে আন্দোলন চালিয়ে যান।

রক্তের মধ্যে রয়েছে জাঠ সম্প্রদায়ের দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা স্পৃহা ও শিখ ধর্মের নির্ভীক নিষ্ঠা। ইংরেজ শাসকের সংগে সংগ্রামের অদম্য ও অক্লান্ত সাধনা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন তাঁর পিতৃপুরুষের কাছে।

একদিকে কাকা অনমনীয় যোদ্ধা অজিত সিং, অন্য দিকে পুণ্যচরিত্র লালা লাজপত রায়ের আদর্শ তাঁর রক্তে রক্তে সঞ্চারিত। পাঞ্জাবের মাটিতে ইংরেজ শাসনের বর্বরতা যখন পাশবিক নিষ্ঠুরতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন ভগৎ সিং-এর বালক-মন এতটুকুও সন্ত্রস্ত হয়নি ; বরং সে প্রস্তুত করেছে নিজেকে সেই দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য। ইতিহাসজ্ঞ অজিত সিং যেমন ইতিহাস-চেতনা দিয়েছেন তাঁর মনে, পণ্ডিত কিষণ সিং দিয়েছেন তেমনি দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের বোধ। প্রেরণা হয়ে থেকেছে মহারাষ্ট্র-নেতা তিলক ও বিপ্লবী অরবিন্দের মাতৃমন্ত্রের শপথ।

স্মরণীয় তাঁর জন্মমুহূর্তটুকুও। পিতা বন্দী লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে, পিতৃব্য শরণ সিং পুলিসের অত্যাচারে জর্জরিত, আর আরেক পিতৃব্য অজিত সিং মান্দালয়ে জেলের নিঃসঙ্গ সেলে বন্দী। সমস্ত পাঞ্জাব বিক্ষোভে উত্তাল।

অজিত সিং-এর ব্যক্তিত্বই ভগৎকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল।

মান্দালয় থেকে লাজপত রায় ও অজিত সিং দু'জনকেই মুক্ত করে পাঞ্জাবে ফিরিয়ে আনা হয়। অজিত সিংকে এর পর অনেক প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শন করা হয়। কিন্তু অজিত সিং তাঁর উন্নতশিরে সকল প্রলোভনকে যেমন উপেক্ষা করেছেন, নির্যাতনকেও তেমনই সহ্য করেছেন। পাঞ্জাবে ফিরে এসেই তিনি আবার সভাসমিতিতে বক্তৃতা শুরু করেন। ১৩-৭-১৯০৯ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, তিনি চার হাজার লোকের এক সমাবেশে Rise and fall of Nations এই পর্যায়ে বক্তৃতা দেন। এই সময়ে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—"মহিব্বনি ওয়াতন" বা দেশপ্রেমিকদের ইতিহাস।

লাহোরের জেলাশাসক অজিত সিংকে ডেকে সাবধান করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অজিত সিং ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন—আমি যা ঠিক মনে করি, তা করবোই ; কপালে যাই জুটুক না, তার জন্যে ভ্রূক্ষেপ করি না।

বিপিনচন্দ্র পাল মুক্তি পাওয়ায় লাহোরের এক জনসমাবেশে অজিত সিং জ্বালাময় বক্তৃতায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। জেলাশাসকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—সবগুলি প্রদেশ এগিয়ে চলেছে, আমি চাই পাঞ্জাবও এগিয়ে চলবে। বিপিন পালের মত দেশপ্রেমিক মুক্তি পাওয়ায় সকলেরই আনন্দ প্রকাশ করা কর্তব্য। আমি চাই পাঞ্জাবের প্রতিটি লোক—শিশুরাও—দেশপ্রেম কি তা' বুঝতে শিখুক।[১২]

১৯০৯ সালে পুলিসের অত্যাচার এড়াতে অজিত সিং পারস্যে চলে যান। সেখান থেকে জার্মানি হয়ে ব্রাজিলে।

আর শরণ সিং? লালচাঁদ ফালক ও শরণ সিংকে গ্রেপ্তার করে কঠোর অত্যাচার করা হয়। জেলের নির্মম কঠোরতায় টি. বি. রোগে জীর্ণ শরণ ১৯১০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভগৎ-এর জীবনে তাঁর জননীর প্রভাবও কম নয়। বিদ্যাবতী ছয় পুত্র ও তিন কন্যার জননী। প্রথম পুত্র জগৎ এগারো বছর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় ভগৎ। তাঁর পর আরও চার পুত্র—কুলবীর, কুলতার, রাজেন্দ্র ও রণবীর, এবং তিন কন্যা—অমর কাউর, সুমিত্রা কাউর ও শকুন্তলা। নির্যাতিত পরিবারে বধূ বিদ্যাবতীর জীবন বেদনা ও আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে থেকেছে। শিশু ভগৎ নিরন্তর দেখেছে তার কাকীমাকে (অজিত সিং-এর স্ত্রী)—যিনি সারাজীবন নিঃসঙ্গ বেদনায় ছটফট করেছেন। ক্রন্দনময়ী তার কাকীকে শিশু বলেছে—তুমি কেঁদো না। আমি আর একটু বড় হই, তারপর ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে কাকাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।[১৩]

অজিত সিং ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু অনেক পরে। জওহরলালের চেষ্টায় স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে তিনি দেশে ফেরেন। আর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে মারা যান। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা—ভগবানকে ধন্যবাদ। আমাদের সাধনা সফল হয়েছে।[১৪]

॥ দুই ॥

"The revolution can always be advanced and brought to maturity only through an active and hard struggle. If an active struggle is neglected, only waiting for a favourable situation to arise by reason of the arduousness of the resolution, revolutionary forces cannot be fostered." —Richard Wagner

১৯০৮ সালের ভারতবর্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে যে প্রবল উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের জন্ম হয়েছিল তার কারণ ছিল একদিকে ইংরেজ শাসনের স্বেচ্ছাচারিতা অন্য দিকে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রেরণা। এই সময়ে

বিপ্লবের আদর্শ ও পন্থার নির্দেশ বহন করে নিয়ে এসেছিল ম্যাটসিনি (Mazzini) ও গ্যারিবল্ডির জীবনী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন পর্যন্ত একমাত্র সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের মনোভাবকে ব্যক্ত করে বলতে পারতো। কিন্তু তখনও এই কংগ্রেস এমন কয়েকজন নেতার ইঙ্গিতে চলতো, যাঁরা চেয়েছিলেন আবেদন ও যুক্তির পথে শাসন-সংস্কার মাত্র। কিন্তু স্বাধীনতার স্বপন যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা জানতেন অনেক আত্মত্যাগ অজস্র রক্তক্ষরণ ও প্রাণ বলিদানের প্রয়োজন আছে।

একদিকে অরবিন্দ ও বিপিন পাল, অন্যদিকে তিলকের প্রেরণায় নবজাগ্রত যুবমানস আত্মদান ও কৃচ্ছ্রতার পথ বেছে নিয়েছিল। তারা জানতো, বিপ্লব মানে পূর্ণ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা। তাই তারা নিজেদের বিপ্লবী বলে প্রচার করেছে। কিন্তু শাসক ইংরেজ, ও তাঁদের অনুকরণ করে আমরাও, এই নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী নামে ভূষিত করতে চেয়েছি। সন্ত্রাসবাদী মানে, যারা দেশে সন্ত্রাসেব সৃষ্টি করে অবাজকতা আনতে চায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা নিজেদের জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা বোমা ও রিভলবাব ব্যবহার কবেছে। হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম—অত্যাচারেব প্রতিশোধ নেওয়া, দ্বিতীয়—দেশের সাধারণ মানুষকে সজাগ করে তোলা ; আত্মদানের উদাহরণ সামনে রেখে ভবিষ্যতের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা, যাতে স্বাধীনতার সংগ্রামে তারা এগিয়ে আসে।

কলকাতায়, পুণায়, নাসিকে ও বোম্বেতে যেমন গুপ্ত বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে উঠেছে তেমনি উঠেছে লণ্ডনে ও প্যারিসে—শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম ভিকোজী কামার প্রেরণায়। পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে হলে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন আছে এ কথা সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন অরবিন্দ ও তিলক দু'জনেই। লণ্ডনে কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকরের 'ইণ্ডিয়া হাউস' এই সশস্ত্র বিপ্লবের পথকে সুগম করবার জন্য একযোগে কাজ করেন। মাদাম কামা উদ্দীপ্ত ভাষায় লেখেন—"সভায় বাঙলোতে রেলপথে রেলগাড়ীতে দোকানে গির্জায় বাগানে অথবা কোন মেলায়—যেখানে পার, যেখানে সুবিধা হইবে, সেখানেই ইংরেজদের হত্যা কর।"[১৫]

এই প্রবল ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ ঃ ইংরেজ ভারতবর্ষে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন (মাইকেল এডওয়ার্ডস্-এর ভাষায় Benevolent Despoticism) চালাতে চেয়েছিল। এই শাসন-ব্যবস্থার নগ্নরূপ প্রথম উপলব্ধি করার সংগে সংগে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সৃষ্টি। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয় ভারতীয় সৈনিকদেরই সহযোগিতায়। তারপর সারা দেশ জুড়ে অত্যাচারের যে তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়, তা ভুলে যাওয়া কোন দেশের মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় খন্ড খন্ড বিদ্রোহের ছবি। যেমন ওয়াহাবি আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ ইত্যাদি। ১৮৬৫ সালে পাঞ্জাবের 'কুকা বিদ্রোহ' প্রকৃতপক্ষে নিরস্ত্র আন্দোলন ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু সেদিনও এই আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকার কামান দেগে নিরস্ত্র মানুষের দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

একদিকে যেমন এই নির্দয় নিপীড়ন, অন্যদিকে তেমনই নির্লজ্জ শোষণ। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপহরণ করে ইংলন্ডের বণিক সম্প্রদায় ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগলো। আর ভারত জুড়ে দিনের পর দিন শুধু দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষ, শুধু মৃত্যু আর হাহাকার।

এরই মধ্যে আলোকস্তম্ভের মত দাঁড়িয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী, ইতালীর ম্যাটসিনির গুপ্তবিপ্লবের ইতিহাস।

১৯০৭ সালে অর্থাৎ ভগৎ সিং যে বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বছরেই বাংলাদেশে এবং কলকাতায় প্রথম বোমা তৈরী করলেন উল্লাসকর ও হেমচন্দ্র দাসের সহযোগিতায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বলা যেতে পারে, ভগৎ সিং-এর জন্মমুহূর্ত ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার এক পরম শুভক্ষণ। লাজপত রায়ের রাজনৈতিক ক্ষুরবুদ্ধি, অজিত সিং-এর আমৃত্যু সংগ্রাম এবং কর্তার সিং সরোবার মহৎ আত্মদানকে সমন্বিত করে বিপ্লবের রূপকে বিমূর্ত করে তুলতে এই পরম মুহূর্তে তাঁর জন্ম।

১৯০৮ সালে অর্থাৎ ভগৎ যখন এক বছরের শিশু তখন মুক্তিসংগ্রামীদের প্রথম শহীদ আঠারো বছর বয়সের যুবক ক্ষুদিরাম নির্ভীক হৃদয়ে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। এই ক্ষুদিরাম উল্লাসকর দত্ত'র হাতের তৈরী বোমা নিয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নির্দেশে মুজাফফরপুরে ছুটে গিয়েছিলেন। কারণ, অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে মারতে

হবে। বোমাকে বিপ্লবীরা হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—স্বেচ্ছাচারী শাসককে সন্ত্রস্ত করা এবং সংগে সংগে দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে আলোড়ন তুলে দেওয়া। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লব আন্দোলনেই বোমার ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে একই কারণে। ১৯০৭ সালেই কিছু রাশিয়ান বিপ্লবী বোমা নিয়ে জারের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল জারকে হত্যা করা। তার আগে ১৯০৬ সালে রাশিয়ান তরুণী দোব্রোদজিকা ওয়ারশ'র গভর্নর স্কালনকে হত্যার জন্য বোমা ছুঁড়েছিলেন। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সেল... সিলভারস্টিন নামের এক রাশিয়ান নারী নিউইয়র্কে এক পুলিসের দলের ওপরে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। বোমাটি তাঁর হাতের মধ্যেই ফেটে যাওয়ায় তাঁর ডান হাতটি উড়ে যায়। একই বছরে মস্কোর এক বালিকা বিদ্যালয়ে কুড়ি পাউন্ড ওজনের একটি বোমা আবিষ্কৃত হয়।

বাংলার হেমচন্দ্র দাস তার সর্বস্ব বিক্রি করে ফ্রান্সে গেলেন বোমা তৈরী শিখতে। ফ্রান্সে মাদাম কামা তাঁকে রাশিয়ার বিপ্লবীদের সংগে পরিচিত করিয়ে দেন। ৩২ মুরারিপুকুর স্ট্রীটে বারীন্দ্র ও উল্লাসকর যে বোমা তৈরী করেন, তার শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেওঘরে প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাণ দিলেন। কিন্তু সেই বোমা নিয়েই মুজাফফরপুরে কিংসফোর্ডকে মারতে ছুটেছিলেন প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু।

ক্ষুদিরাম বসু—আঠারো বছরের এক যুবক যেদিন ফাঁসিতে ঝুলে প্রাণ দিলেন সেদিন সমস্ত দেশের সামনে বিপ্লবীদের ত্যাগ বীর্য ও আত্মোৎসর্গের আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মহারাষ্ট্রের 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন—

"It was the Western science itself that created new guns, new muskets, and new ammunition and bomb··· The military strength of no government is destroyed by bombs ;'the bomb has not the power of crippling the power of an army, nor does the bomb possess the strength to change the current of military strength, but owing to the bomb the attention of Government is attracted towards the disorder which prevails owing to the pride of military strength." (Keshari—June 22, 1908)

অর্থাৎ—পশ্চিমী বিজ্ঞানই মানুষকে নতুন নতুন বন্দুক ও গোলাবারুদ তৈরী করতে শিখিয়েছে। পশ্চিমী বিজ্ঞানই বোমারও সৃষ্টি করেছে।—বোমা দিয়ে কোন গভর্নমেণ্টের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করা যায় না, সামরিক বাহিনীর শক্তিকেও খর্ব করা যায় না ; এমন কি সামরিক শক্তির ধারাকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতাও বোমার নেই। কিন্তু সামরিক শক্তির দম্ভ দেশের মধ্যে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে, তার প্রতি সরকারের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে আনতে পারে।

এর একুশ বছর পরে ১৯২৯ সালের জুন মাসে ভগৎ সিং দিল্লীর সেণ্ট্রাল অ্যাসেম্বলি হলে বোমা ফাটানোর সমর্থনে যে বিবৃতি দেন তার মধ্যেও যেন তিলকের কথাবই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ১৯২৯-এর ৬ই জুন তাঁর বিবৃতিতে ভগৎ সিং বলেছিলেন—

"The attack was not directed towards any individual, but against an institution itself···"

বোমা ও রিভলভারকে বিপ্লবের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করার জন্য সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়—বিনায়ক সাভারকার ও গণেশ সাভারকার সচেষ্ট হয়েছিলেন। নাসিকে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গণেশ সাভারকারের 'অভিনব ভারত সোসাইটি' লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র সংগে যোগাযোগ রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে সুগম করবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল।

The evidence showed the establishment of a secret society at Satara in 1907 for the purpose of effecting the liberty of the country. It was a branch of 'Abhinava Bharat' founded by Ganesh and Vinayaka Savarkar. One of the accused was found to have been experimenting in the preparation of bombs.

—(Report of the Sedition Committee)

অর্থাৎ—সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে সাতারায় একটি গুপ্ত সমিতি সৃষ্ট হয়েছিল। এই সমিতি গণেশ ও বিনায়ক সাভারকার প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারতে'র শাখা ছিল। অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে দেখা গিয়েছিল বোমা তৈরী করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে।

সিডিশন কমিটির রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯০৮ সালে লণ্ডনের

'হাণ্ডয়া হাউসে' বিনায়ক সাভারকার বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিলেন। সাভারকারের এক সহকর্মী মদনলাল ধিংরা ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে স্যর উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলিকে গুলী করে হত্যা করলেন। ধিংরার জামার পকেটে এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেল। তাতে লেখা ছিল, আমি ইচ্ছাকৃত চেষ্টায় একজন ইংরেজকে হত্যা করলাম। কারণ ভারতবর্ষে যুবকদের খুশিমত ফাঁসিতে ঝোলানো এবং অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যে নির্বাসিত করার বিরুদ্ধে এটা সামান্য একটু প্রতিবাদ।

চিরঞ্জী রাও নামের এক যুবকের কাছ থেকে একটি ছাপানো ইস্তাহার উদ্ধার করলো পুলিস। এই চিরঞ্জী রাও বিনায়ক সাভারকারের লোক। ইস্তাহারটিতে লেখা ছিল—ক্ষুদিরাম বসু ও কানাইলাল দত্তরা যে গৌরবান্বিত পথের উদ্বোধন করেছেন, তার ক্রমাগত অনুসরণই ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে পঙ্গু করে দেবে।[১৬]

ভারতে ও ভারতের বাইরে সেদিন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা যে সশস্ত্র পন্থার পথে এগিয়ে চলেছিল, তারই উত্তরসূরী হবার জন্যই সেই এক ক্রান্তিকালে জন্ম নিলেন ভগৎ সিং।

১৯০৮ সালে লাহোরেও গুপ্ত সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ দেখা দেয়। যুবক হরদয়াল লণ্ডন থেকে ফিরে এলেন লাহোরে। তিনিই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য গোপন প্রচারকার্য শুরু করলেন। হরদয়ালের দুই অনুগত সহকর্মী ছিলেন—জে. এন. চ্যাটার্জী ও দীননাথ। চ্যাটার্জীর মাধ্যমে দীননাথের সঙ্গে দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হেড ক্লার্ক রাসবিহারী বসুর আলাপ হয়। রাসবিহারী বসু দীননাথ ও তাঁর দুই বন্ধু অবধবিহারী (Avadh Behari) ও ভাই বালমুকুন্দকে বিপ্লবে দীক্ষা দিলেন এবং তাদের বোমা ছুঁড়তে শেখালেন। অবধবিহারীর বন্ধু আমীরচাঁদও দলে যোগ দিলেন।

আমীরচাঁদ দিল্লীর মিশন হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। লালা হরদয়াল আবার বাইরে চলে গেলে সংগঠনের ভার তিনিই গ্রহণ করেন। এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন রাসবিহারীর অনুচর বসন্ত বিশ্বাস।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে এক শোভাযাত্রার মধ্যে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা পড়লো। হার্ডিঞ্জ আহত হলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই (১৯১৩-মে) লাহোরের লরেন্স পার্কে একটি বোমা ফাটলো। ফলে

এক ব্যক্তি মারা গেল। এই দু'টি ঘটনায় কিছুকালের মধ্যেই ধরপাকড় শুরু হয়। ফাঁসিতে ঝোলানো হয় আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসকে। কিন্তু রাসবিহারী বসুকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

ফাঁসির আগে অবধবিহারীকে এক ইংরেজ অফিসার জিজ্ঞাসা করে—তোমার শেষ ইচ্ছা কি ?

চটপট উত্তর দিলেন অবধবিহারী—ইংরেজ রাজত্বের অবসান। অবধবিহারী আরও বললেন,—আমি চাই যে, এই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে যাক্। এ আগুনে আমি, তুমি এবং আমরা সবাই ছাই হবো। তার সংগে পুড়ে নিঃশেষ হবে আমাদের দাসত্ব।[১৭]

ভগৎ সিং তখন ছয় বছরের বালক মাত্র। কিন্তু সেই বালকের কাণে অনুরণিত হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বীরের অগ্নিময় বাণী। শহীদের মৃত্যুর স্মৃতি তার চেতনায় রক্তের লেখায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ডাক দিয়ে গেল।

ভগতের শিশুমনে এই ঘটনাগুলি যে কিভাবে ছাপ রেখেছে তার কিছুটা পরিচয় আমরা তার শৈশবকাহিনী থেকে অনুমান করতে পারি। পিতা সর্দার কিষণ সিং তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু জাতীয়তাবাদী নেতা মেহতা আনন্দকিশোরকে নিয়ে বাগানে গিয়ে বসেছেন। সংগে রয়েছে শিশু ভগৎ। ভগৎ আপন মনে বাগানে বসে খেলছে। মাটি দিয়ে সে ছোট ছোট ঢিবি সাজাচ্ছে, আর তাতে একটি একটি করে কাঠি গুঁজে দিচ্ছে।

আনন্দকিশোরের চোখ পড়লো সেদিকে। কৌতূহলী হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি করছো তুমি ? সগর্বে মাথা তুলে বালক বললে—যুদ্ধ। দেখছো না, এগুলো সব বন্দুক ?

সে আংগুল দিয়ে সেই কাঠিগুলো দেখিয়ে দিলো। আনন্দকিশোর বললেন—বন্দুক দিয়ে কি করবে ?

—ইংরেজ তাড়াবো। ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা স্বাধীন হবো।[১৮]

ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করবার এই প্রেরণা ভগৎ সিংকে অহর্নিশ তাড়া করে ফিরেছে। বন্দুক আর বোমা তৈরীর চেষ্টায় তিনি ছুটেছেন পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশে। এই মূক, নিস্পৃহ ও চেতনাহীন জনতার মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টায় ঝাঁপ দিয়েছেন মৃত্যুর আগুনে।

॥ তিন ॥

বঙ্গা গ্রামে জেলা বোর্ডের প্রাইমারি স্কুলে পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি হয়েছিল সর্দার কিষণ সিং-এর ছেলে ভগৎ। ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটিকে যে দেখতো, সেই খুশী হতো। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা তো তাকে ঘাড়ের ওপর নিয়ে ঘুরতো।

সেই বয়েসেই কিন্তু ভগৎ সুযোগ পেয়েছিল দেশের বিপ্লবী নেতাদের সান্নিধ্য পাবার। কিষণ সিং-এর সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়। ছিলেন সুফী অম্বাপ্রসাদ ও মেহতা আনন্দকিশোর। অম্বাপ্রসাদ অজিত সিং-এর সহযোগী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই ভারত ত্যাগ করে ইরানে চলে গিয়েছিলেন। ইরানেও ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ রচনা করেন এবং ১৯১৫ সালে বন্দী হবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মৃত্যুবরণ করেন। আর মেহতা আনন্দকিশোর —কিষণ সিং-এর সুহৃদ তিনি।

শিশু ভগৎ সিং দিনের পর দিন শুনতো তাঁদের গুপ্তসমিতি 'ভারত মাতা সোসাইটি'র ঘটনা। তার চরিত্রের ওপর প্রভাব পড়েছে অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদের। দেখা গিয়েছে খেলাধুলোতেও সে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ছেলেদের নিয়ে দল বাঁধতো। দুটো দল হয়ে লড়াই করতো তারা। আর একটু বড় হয়ে ভগৎ সিং খেলাধুলোতে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। বাবা কিষণ সিং-এর কাছে তরোয়াল খেলা শিখলো। এক সময়ে সারা লাহোরে তরোয়াল খেলায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না।

ভগৎ-এর জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছিল তার কাকী হরনাম কাউর-এর। সর্দার অজিত সিং-এর স্ত্রী হরনাম। স্বামী পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রচনা করতে। তাঁকে পালিয়ে যেতে হয়েছে নেপালে। ১৯০৭ সালে তিনি নির্বাসিত হয়েছেন মান্দালয়ে। ১৯০৯ সালে অম্বাপ্রসাদের সঙ্গে অজিত সিং ভারত ত্যাগ করে ইরানের পথে রওনা হয়েছেন। তখন তাঁর বয়েস ২৩/২৪। সেই অজিত সিং-এর স্ত্রী হরনাম কাউর তাঁর সারাটা জীবন ধরে ব্যাকুল উদ্বেগে

অপেক্ষা করেছেন স্বামীর জন্যে। অথচ ফিরে এলেও তো নিষ্কৃতি নেই হয় জেল, নইলে মৃত্যু।

হরনাম নিজে সমাজসেবার কাজে এগিয়ে গিয়েছেন। বাচ্ছাদের বিদ্যালয় ও মেয়েদের প্রতিষ্ঠানের সংগে নিজেকে তিনি জড়িয়ে রেখেছেন। ভগৎই তাঁর ছেলের মত। ভগৎকে তিনি বসে বসে গল্প শোনাতেন। চোখের জলে তিনি গল্প শোনাতেন অজিত সিং আর অম্বাপ্রসাদের। শিশু ভগৎ দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলতো—দাঁড়াও, আমি আর একটু বড় হই, তারপর কাকাকে ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবো।

হরনাম তাকে অন্য বিপ্লবীদের গল্পও বলতেন। বলতেন ক্ষুদিরামের ফাঁসির গল্প, সাভারকার আর মদনলাল ধিংরার গল্প; লণ্ডনে বসে ধিংরা যেভাবে কার্জন ওয়াইলিকে গুলী করে মেরে ফাঁসিকাঠে গিয়ে উঠলেন, তারই কাহিনী। প্রতিশোধ নেবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় তখন ভগৎ-এর রক্ত টগবগ করে ফুটতো।

।। চার ।।

ভগৎ সিংকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছিল কর্তার সিং সরোবার অদম্য দেশপ্রেম এবং নির্ভীকতা। এই যুবক মাত্র উনিশ বছর বয়সে ফাঁসি-কাঠের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—যতদিন আমার দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন আমি যেন বারবার জন্মগ্রহণ করি, আর বারবার নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি। কর্তার সিং সরোবা ছিলেন ভগৎ সিং'এর আদর্শ—হিরো।

লাহোর জেলে ১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে কর্তার সিং সরোবাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ভগতের বয়স তখন আট বছর মাত্র। সেই বয়সেই তার বুকে উনিশ বছরের মৃত্যুবিজয়ী তরুণ কর্তার সিং-এর উজ্জ্বল হাসিমুখ চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

কর্তার সিং সরোবা ছিলেন 'গদর' বিপ্লবের অন্যতম নায়ক। এই 'গদর' বিপ্লবের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রথম একটি সংহত ও ব্যাপক বিপ্লবের রূপ নেয়। লাহোরে গুপ্তবিপ্লবের স্রষ্টা হরদয়াল ১৯১১তে আমেরিকা যান; সানফ্রান্সিসকোতে তিনি প্রবাসী পাঞ্জাবী ও শিখদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। 'যুগান্তর আশ্রম' প্রেস ও

'গদর' পত্রিকার মাধ্যমে হরদয়াল প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন।

আর্থিক দিক থেকে পাঞ্জাব তখন অত্যন্ত দুর্গত অবস্থায় পৌঁছেছে। বেকার হিন্দু ও শিখরা কাজের সন্ধানে আমেরিকা ও কানাডায় ছুটতো। কাজ পেলেও সম্মান তারা পেতো না। সেখানে প্রতিমুহূর্তে তারা অনুভব করতো পরাধীনতার বিজাতীয় গ্লানি। ইউরোপীয় জাতিগুলির কাছে তারা কালো চামড়া, স্লেভ ইত্যাদি নামে চিহ্নিত। বিদ্বেষ ও ঘৃণার মধ্যে যখন তারা মগ্ন, তখন তাদের সামনে নতুন আলোর সংকেত নিয়ে এল "গদর-ই-গুঞ্জ" (বা বিপ্লবের পদধ্বনি) নামক পত্রিকা। বললো— তোমাদের এই দুর্গতির জন্যে দায়ী ব্রিটিশ শাসন। ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশের কর্তৃত্বকে যতদিন উৎখাত করতে না পারছো, ততদিন তোমাদের শান্তি নেই।

প্রকাশ্য বিদ্রোহের ডাক দিয়ে লিখলো 'গদর'—এই অত্যাচারী সরকারের উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের। ১৯১৩ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সানফ্রান্সিস্কো ও সেক্রামেণ্টোতে প্রকাশ্য সভায় ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবিকে তুলে ধরা হল। শেষের সভাটিতে 'গদর' পার্টিরও সৃষ্টি করা হয়। সভাপতি হন বাবা সোহন সিং ভাকনা, সেক্রেটারি হরদয়াল নিজে। 'গদর' উর্দু শব্দ, যার অর্থ হল—বিদ্রোহ বা গণ-জাগরণ।

অদ্ভুত দ্রুততার সংগে 'গদর' পার্টির কাজ ছড়িয়ে পড়লো। প্রত্যেকটি প্রবাসী ভারতীয়ই এই পার্টির সভ্য হলেন এবং শপথ গ্রহণ করলেন যে, ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়ণের জন্য তাঁরা ভারতে ফিরে যাবেন, এবং প্রাণ উৎসর্গ করবেন। ৩১শে ডিসেম্বর (১৯১৩) তারিখের সভায় হরদয়াল ঘোষণা করলেন যে, জার্মানি শীগ্‌গিরই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কাজেই বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্যে এখনই ভারতে ফিরে যাওয়া দরকার। হরদয়ালের সংগঠনের কাজে তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন রামচন্দ্র ও বরকতুল্লা।[১৯]

ঠিক এই মুহূর্তে আর একটি ঘটনা ঘটলো। সর্দার গুরুদিৎ সিং নামে এক পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টর কর্মসন্ধানী পাঞ্জাবীদের কানাডায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি জাহাজ ভাড়া করেন—কোমাগাটামারু। কিন্তু কানাডায় এঁরা প্রবেশ করতে না পারায় 'কোমাগাটামারু' আবার ফিরে আসে।

সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কোমাগাটামারুতে নিয়মিতভাবে 'গদর' পত্রিকা ও উত্তেজক ইস্তাহার ও কাগজপত্র বিলি করা হতো। ইয়োকোহামাতে দু'জন বিপ্লবী নেতা এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। ভ্যানকুভারে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ হয়। কিন্তু কানাডায় স্থান না পেয়ে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ মনে ২৩শে জুলাই (১৯১৪) তাঁরা আবার ভারতের পথে রওনা হন। ভ্যানকুভারে তাঁরা প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রও সংগ্রহ করেন।

এই সময়েই প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা। 'কোমাগাটামারু' বজবজে এসে পৌঁছোয় ১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সকাল ১১-০০ টায়। এই বজবজে তাঁদের প্রতিরোধে একদল সশস্ত্র সৈন্য এগিয়ে আসে এবং তারা যাত্রীদের ওপর গুলী চালায়। এইভাবে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে আক্রান্ত হয়ে 'কোমাগাটামারু'র যাত্রীরাও রুখে দাঁড়ায়। ফলে একটি প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সংঘাতে আঠারোজন যাত্রী নিহত হয় এবং প্রায় চব্বিশজন গুরুতর আহত হয়। গুরুমুখ সিং ও গুরুদিৎ সিং প্রমুখ কয়েকজন আত্মগোপন করেন। বাকি অন্যদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইতিমধ্যে 'গদর' পার্টির দলবলও ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াতে তাঁদের অনেকে সিঙ্গাপুর, বর্মা ও সিলোনে নামলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মী ও নেতারা এলেন 'তোশামারু' জাহাজে। বহু লোককে গ্রেপ্তার করে অথবা স্বগ্রামে অন্তরীণ করার পর গভর্নমেণ্ট যখন কিছুটা নিশ্চিন্ত যে 'গদর' দল ভেঙে গিয়েছে, তখন কিছু লোক আত্মগোপন করে দল সংগঠনের দিকে মন দিলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাঁরা বিপ্লবের বাণী প্রচার করে 'গদর' আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলতে ব্রতী হলেন।

যাঁরা এইভাবে গোপন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কর্তার সিং সরোবা ও বিষ্ণুগণেশ পিংলে।

কর্তার সিং সরোবা সানফ্রান্সিসকোতে 'গদর' পত্রিকা ও পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। পার্টির মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্য। তিনি ভালো লিখতে পারতেন এবং উত্তেজক ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন। ১৯১৪ সালের (১৩ই জানুয়ারি) 'গদর' পত্রিকায় ভারতীয়দের আহ্বান করে বলা হল যে, তারা বাইরে বন্দুক,

রাইফেল ও রিভলভার চালাতে শিখুক। তারপর ফিরে আসুক পাঞ্জাবে। সঙ্গে নিয়ে আসুক গোপন অস্ত্রসম্ভার। কারণ বিপ্লব আসন্ন।

পাঞ্জাবের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগের জন্য পিংলে ও ভাই পরমানন্দ (ঝাঁসি) অগ্রণী হন। বেনারস থেকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে নিয়ে লাহোরে এসে উপস্থিত হন। তারপর ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে যায়। পাঞ্জাবের সর্বত্র, উত্তর বাংলাতে গণ-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শুরু হয়। বাংলার নেতা তখন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী।

এদেশের মানুষকে পায়ের তলায় রাখবার জন্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে এদেশীয় সৈন্যদেরই সাহায্য নিতে হয়েছে। ১৯১৫তে মহাযুদ্ধে বিব্রত ইংরেজ সরকার তার নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইউরোপে। গদর বিপ্লবীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাই পাঞ্জাবে, ফিরোজপুরে, মীরাটে, লখনউতে, বেনারসে—সর্বত্র সৈন্যব্যারাকে ঘুরতে লাগলেন তাঁরা। এ কাজের ভার নিলেন প্রধানতঃ সরোবা ও পিংলে। তাঁরা একাজে কিভাবে এগিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য বহন করছে সিডিশন কমিটির রিপোর্ট—

"···Certain revolutionaries, three at least from Canada, collected in Bangkok and engaged in a plot to invade India by way of Burma..... We have clear evidence that this design did exist, and that it was part and parcel of the Ghadr Movement in which German agents were concerned..."

অন্যত্র "Ghadr newspaper and its progeny were distributed in every place where the revolutionaries hoped to gain adherents and particularly among troops..."

(বিপ্লববাদীদের মধ্যে কিছু লোক এবং তাদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন কানাডা প্রত্যাগত—ব্যাংককে সমবেত হয়ে বার্মার পথে ভারত আক্রমণের এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।—আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, এই ষড়যন্ত্র গজিয়ে উঠেছিল, এবং এটা গদর আন্দোলনের একটা অংশ ছিল। এই গদর আন্দোলনে জার্মানচরদেরও যোগ ছিল—)

(গদর সংবাদপত্র এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইস্তাহার ও বৈপ্লবিক

কাগজপত্র সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ; যেখানে যেখানে বিপ্লবীরা সমর্থন পাওয়ার আশা করেছে এবং বিশেষভাবে সৈন্যবাহিনীতে—তারা এইসব কাগজ ছড়িয়েছে।)

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের দিন স্থির হয়েছিলো। কিন্তু বিপ্লবীদের এত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল সেই একই কারণে—বিশ্বাসঘাতকতায়। জনৈক সভ্য (কৃপাল সিং) সমস্ত ঘটনা গোপনে ফাস করে দিলো গভর্নমেণ্টের কাছে। সংগে সংগে সমস্ত পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেল।

কর্তার সিং সরোবার হতাশা কি বিপুল তার বর্ণনা ভগৎ সিং নিজেই দিয়েছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে। সরোবার কথা লিখতে গিয়ে ভগৎ সিং লিখেছেন—"লাহোরের একটি ঘরে একটা চারপাইতে মৃত্যমান রাসবিহারী বসু ; কর্তার সিং এসে সেই চারপাইতেই বসলেন—কিন্তু অন্যদিকে মুখ করে। কেউ কোন কথা বললেন না ; কারও বুঝতে বাকি ছিল না, অপরের বুকে কি চিন্তা ! তাঁদের সেই মুহূর্তের অনুভূতি আমরা কি করে বুঝতে পারি ?"

এই বলে ভগৎ সিং একটি উর্দু দোহা উদ্ধৃত করেছেন—

হায়, আমাদের কাজ হয়েছে
শুধু পরিকল্পনার
দুয়ারে মাথা ঠোকা।
ভাগ্যকে যে একবার জানবো—
তার পথই তো ধরতে পারলাম না।

লাহোরে পুলিস ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়েছে। তার মধ্য থেকে রাসবিহারী বসু হলেন নিখোঁজ। খুঁজে পাওয়া গেল না পিংলে ও সরোবাকে। কিন্তু সরোবা পালাতে চান নি। তিনি তখনও শেষ প্রচেষ্টায় কিছু করবার জন্যে ছোটাছুটি করছিলেন। সরগোধা জেলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। একমাসের মধ্যে পিংলেও ধরা পড়েন মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায়। পিংলের কাছে যে বোমা পাওয়া যায় তা নাকি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল।

২৭শে মার্চ (১৯১৫) লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুরু। সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, আসামীরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সৃষ্টি করতে চেয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহের

প্ররোচনা দিয়েছে। রাসবিহারী বসুকে নেতারূপে বর্ণনা করে সরকারী কে স্লিলি বলেন যে,

"Early in February he arranged for a general rising......He went there and sent out emissaries to various cantonments in Upper India to procure military aid for the appointed day. He also tried to organise the collection of gangs of villagers to take part in the rebellion. Bombs were prepared; arms were got together; flags were made ready; a declaration of war was drawn up.... .."

(ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে তিনি এক সাধারণ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন।···তিনি লাহোরে যান এবং নির্ধারিত দিনে সামরিক সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায় দূত প্রেরণ করেন। এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের জন্য গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করে আনার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। এর জন্য বোমা তৈরী করা হয়, অস্ত্র সংগ্রহ করে একত্র করা হয়। পতাকা পর্যন্ত প্রস্তুত করে যুদ্ধঘোষণার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়।)

অভিযুক্তদের সংখ্যা প্রায় আশিজনের মত। তাঁদের মধ্য থেকে সাত-জনের একটি দল সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিলেন। এঁরা জানতেন যে, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সরাসরি প্রমাণিত হবে, তাঁদের ফাঁসী কাঠে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা সচেতন ছিলেন যে, এত আত্মদান যেন বিফলে না যায়। অন্ততঃ দেশের মানুষ এই ইতিহাস জানুক। ভবিষ্যতের আন্দোলনের জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করতে তাঁরা ব্যাকুল হলেন।

সাতজনের সেই দলটি সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের ওপর টেনে নিলেন। আর তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে দাঁড়ালেন উনিশ বছর যাঁর বয়েস, সেই উজ্জ্বল মুখ যুবক—কর্তার সিং সরোবা। "আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা। যারা আমাদের দেশকে পরাধীনতার পাশে বেঁধে রেখেছে, আমরা তাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি।—আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার জন্য যে অগ্নিশিখা জ্বলছে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে সে অগ্নিকে নিভিয়ে দিতে পারে।"

সরোবার উদ্দীপ্ত ভাষণে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে ছিলো সকলে। বিস্মিত

হয়ে গিয়েছিল ইংরেজ বিচারপতি। একসময়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল —তুমি কি জানো, তুমি যা বলছো—তার ফল কি হতে পারে ?

সরোবার মুখে বিদ্রুপের হাসি দেখা দিয়েছিল। "—জানি, হয় সারাজীবন কারাদণ্ড আর নইলে মৃত্যু। আমি চাইবো মৃত্যুদণ্ড, যাতে আমি বারবার জন্ম নিয়ে দেশের জন্যে বারবার মৃত্যুবরণ করতে পারি।"

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে উঠলেন কর্তার সিং সরোবা। তাঁর সঙ্গে বিষ্ণুগণেশ পিংলে, বখশিশ সিং গিলওয়ালি, সুরাইন সিং গিলওয়ালি, হরনাম সিং গিলওয়ালি, জগৎ সিং সুরসিং এস. গিলওয়ালি।

ভগৎ সিং তখন আট বছরের বালক। কিন্তু সেই বালকের মনে গাঁথা হয়ে গেল সরোবার দেশপ্রেম, সেই আত্মদানের ছবি। তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল সরোবাকে দেখবার। পিতা কিষাণ সিং-এর কাছে আসতেন কর্তার সিং সরোবা। গোপনে আলোচনা করতেন। বালক ভগৎ সিং তাঁকে বড় কাছে থেকে দেখেছিল।[২০] সরোবার ছবি তিনি সবসময়ে কাছে রাখতেন। মাকে বলতেন,—আমার বীর, আমার আদর্শ।

ভগৎ সিংকে পরবর্তীকালে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখনও তাঁর পকেটে সরোবার ছবি ছিল। মাতাজী (ভগৎ-জননী বিদ্যাবতী) বলেন—কর্তার সিং-এর প্রিয় একটি উর্দু দোহা সবসময়ে ভগৎ'এর কণ্ঠে ফিরতো :

সেবা দেশ দি জিন্দারয়ে বড়ি ঔখি
গালান করনিয়ান ঢের সুখালিয়ান নে,
জিনহান দেশসেবা ভিচ্ পায়ার পায়া।
উনহোনে লাখমুসিবতান ঝলিয়ান নে।

(মুখে কথা বলা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, কিন্তু মাতৃভুমির সেবা অনেক শক্ত কাজ। যারা দেশজননীর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে চায় তাদের অনেক দুঃখ, অনেক বেদনার পথে অগ্রসর হতে হয়।)

কর্তার সিং সরোবার জীবন ও আদর্শকে ভগৎ সিং নিজের বুকের মধ্যে এঁকে রেখেছেন। তাই কর্তার সিং'এর মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পরে এই নিশ্চিত মৃত্যুর পথেই তিনি পা বাড়ালেন। সেদিন তিনিও নিরুদ্বেগ, নির্ভয়। সেদিন তিনিও দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশের মানুষের চেতনাকে উজ্জীবিত করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কর্তার সিং সরোবার মত সর্দার ভগৎ সিংও আদর্শের একটি প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

॥ পাঁচ ॥

কিশোর ভগৎ সিং'এর চেতনায় সঞ্চিত হয়েছে একদিকে যেমন পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনা, অন্যদিকে তেমনই শাসক ইংরেজের বর্বর অত্যাচারের জ্বালা। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ প্রভূত সাহায্য দিয়েছিল। দিয়েছিল সৈন্য ও অর্থ দুইই। গান্ধীর মত নেতারা তখনও বিশ্বাস করছেন যে, সদিচ্ছা ও সহায়তা দিয়ে তাঁরা ব্রিটিশের কাছ থেকে কিছু সংস্কার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কিছু অধিকার আদায় করবেন। ইউরোপে যুদ্ধের পরিণতিতে ব্রিটিশ তখন যথেষ্ট আতঙ্কিত। বাংলার বিপ্লবী দল গান্ধীর সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। পাঞ্জাবে গদর বিপ্লবের সাথে সাথেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগে জার্মানদের যোগাযোগের সংবাদে ভারত সরকার সচকিত। এমন সময় ভারতসচিব ই. এস মণ্টেগু পার্লামেণ্টে ভারতে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন।

মণ্টেগু ১৯১৭ সালের অক্টোবরে ভারতে এলেন এবং পরের বছরেই (১৯১৮) তাঁর বিস্তৃত রিপোর্ট—Indian Constitution Reforms প্রকাশ করলেন। মণ্টেগুর এই রিপোর্টে গান্ধীজী ভারত সম্পর্কে ইংরেজের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটছে ভেবে উল্লসিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি। কারণ দেখা গেল, প্রায় একই সংগে জাস্টিস রাউলাটকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি বসানো হয়েছে, যার কাজ—দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং সন্ত্রাসমূলক কার্য দমনের জন্য গভর্নমেণ্টকে যথেষ্ট ক্ষমতাদান ও প্রয়োগের অনুমোদন। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রাউলাট কমিটির রিপোর্ট কুখ্যাত রাউলাট অ্যাক্ট-রূপে গভর্নমেণ্টের হাতে অবাধ অত্যাচারের ক্ষমতা তুলে দেয়।

ভগৎ সিং তখন ডি. কুলের ছাত্র। ১৯১৬ সালেই গ্রামের স্কুল থেকে তিনি লাহোরে এ ভি. স্কুলে চলে আসেন। এখানে তিনি সান্নিধ্য পান মেহত. .নন্দকিশোরের, যিনি তাঁর পিতা কিষাণ সিং'এর বন্ধু। আনন্দকিশোরের কাছে তিনি শুনতেন ইতিহাসের রোমাঞ্চকর গল্প। বারো বছর বয়সের বালক যখন জীবনকে প্রথম চেতনার রঙে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করছে, তখন তার চোখের সামনে পাঞ্জাবেই

বর্বর ইংরেজ শাসনের স্বরূপ অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো। বস্তুতঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ভারতীয় মানসে যে বেদনা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলো ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

১৯১৮ সালে মণ্টেগুর রিপোর্টের ভিত্তিতে শাসন সংস্কারের নামে আইন সভাগুলিতে কিছু নির্বাচিত ভারতীয়কে গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রপক্ষের অন্যতম শরিক ইংরেজ তার পুরনো প্রভুত্বের দম্ভ ও যথেচ্ছাচারের ক্ষমতাকে কায়েম করতে রাউলাট অ্যাক্ট পাস করালো। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বিপ্লব ধ্বংস করার নামে যে কোন লোককে গ্রেপ্তার, আটক বা অন্তরীণ করার অধিকার সরকারকে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য এভাবে আটক করে রাখার জন্য বিচারের প্রয়োজন ছিল না।

গান্ধীজীর বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। তিনি অন্য নেতাদের সঙ্গে এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলেন। গান্ধীজী পাঞ্জাব যাচ্ছিলেন, পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল পাঞ্জাবের দুই নেতাকে—ডা. সত্যপাল ও কিচলুকে। ফলে সারা পাঞ্জাব আবার বিক্ষোভে ভরে উঠলো। একদল ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা আক্রমণ করলো। চারজন ইংরেজ নিহত এবং একজন ইংরেজ-মহিলা আহত হলেন।

সেনাবিভাগের এক জেনারেল ডায়ারের হাতে পাঞ্জাবের বিশৃংখলা দমনের ভার দেওয়া হল।

১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ (আমাদের ১লা বৈশাখ) অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি স্থানে কিছু নিরস্ত্র জনতা সভা করে প্রতিবাদ জানাতে এসেছিল। তারা সমবেত হয়েছিল চারদিক ঘেরা একটি স্থানে। সেই সমাবেশে শিশু ও নারীও ছিল। কারণ কেউ তখনও কল্পনা করতে পারেনি যে সেই নিরীহ নিরস্ত্র সমাবেশে হিংস্র শ্বাপদের আবির্ভাব ঘটতে পারে।

বস্তুতঃ এই একটি ঘটনাতে অন্ততঃ ইংরেজ চরিত্রের অতি নৃশংস ও ঘৃণিত পরিচয় পাওয়া গেছে। অনেকের মতে রাজভক্ত ভারতীয়দের চেতনাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে এমন একটি ঘটনা ঘটারই প্রয়োজন ছিল। শুধু পাঞ্জাব নয় সারা ভারতের মনে সেদিন ইংরেজশাসনের নির্লজ্জ পাশবতার কাহিনী রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন মাইকেল ও'ডায়ার। তিনি বিক্ষোভ দমনের জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচন করলেন জেনারেল ডায়ারকে। এই ডায়ার নামক লোকটি জালিয়ানওয়ালাবাগের সভার সংবাদ পাওয়ামাত্র একদল গোর্খা ও বালুচ সৈন্য নিয়ে হাজির হল। সভাস্থলের একমাত্র পথটি অবরোধ করে কোন অবসর না দিয়েই সে হঠাৎ 'ফায়ার'-এর হুকুম দিলে। আর সেই নিরীহ জনতা--শিশু বৃদ্ধ ও নারী—মুরগীর ঝাঁকের মতই গুলির মুখে পড়ে আর্তনাদ করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে লাগলো।

গুলির ফাঁকা আওয়াজ নয়। হত্যার জন্য ফায়ারিং। গুলি তখনই থামলো যখন ১৬০৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ শেষ হয়েছে। সরকারী হিসেবে মৃতের সংখ্যা : ৩৭৯ ও আহত ১২০০। জেনারেল ডায়ারের নিজের ভাষাতে—

I fired and continued to fire until the crowd dispersed and I consider this is the least amount of firing which would produce the necessary moral and wide spread effect, it was my duty to produce it, I was to justify my action. If more troops had been at hand, the casualties would have been greater in proportion. It was no longer a question of merely dispersing the crowd, but one of producing a sufficient moral effect from a military point of view not only on those who were present but more especially throughout the Punjab[২১]

(আমি গুলি করতে শুরু করলাম এবং গুলি করে চললাম যতক্ষণ না ভিড়টা ভেঙে ছড়িয়ে যায়। এবং আমি মনে করি, আমি যথেষ্ট কম পরিমাণে গুলি করেছি। নিয়ম ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সুদূর-প্রসারী ফলের জন্য—যা আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে—আমি ঠিক কাজই করেছিলাম। আমার হাতে সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকলে হতাহতের সংখ্যা আরও বেশী হতে পারতো। শুধু ভিড় ভেঙে দেওয়াই তো একমাত্র কাজ নয় ; সৈনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নৈতিক মান সৃষ্টির জন্য—শুধু ওই ক'জন লোকের জন্যে নয়, গোটা পাঞ্জাবের মানুষের জন্যেই এমন একটা উদাহরণের প্রয়োজন ছিল।)

অত্যাচার শুধু এই একটি ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গোটা পাঞ্জাবেই সভ্য ইংরেজ শাসনে সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তন করা হলো। ১৫ই এপ্রিল তারিখে লাহোরের ওপরে প্লেন থেকে বোমা ফেলা হল এবং মেশিন-গান চালানো হলো। প্রকাশ্য রাস্তায় খাঁচা তৈরী করে সেই খাঁচাতে সকলকে ধরে ধরে রেখে দেওয়া হল। কোন কারণ না দেখিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের বেত্রাঘাত করা হতে লাগলো। গোরা সৈন্যদের সামনে সকলকে সেলাম দিতে বাধ্য করা হলো।

বারো বছরের বালকের মনে এই নির্দয় ঘটনার ও বর্বর আচরণের প্রভাব পড়বে না—এমন সম্ভব নয়। ভগৎ সিং কিন্তু প্রতিহিংসার কথা ভাবেনি। তার বাকি জীবনে সে ভেবেছে কিভাবে এই ঘৃণ্য পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

আবার বলবো, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা মনুষ্যত্বসম্পন্ন সমস্ত ভারতবাসীকেই ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুলেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে আরও বলিষ্ঠ করেছে। বিশেষতঃ এমন একটি কলংকজনক ঘটনার যে হোতা, সেই ডায়ারকে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ যখন টাকার তোড়া[১১] উপহার দিলো, তখনই বোঝা গেল যে, ইংল্যাণ্ডের মানবতাবোধ শুধু পাশবিক দমননীতি ও নির্লজ্জ শোষণনীতি ছাড়া আর কিছুই না। কাজেই জাতির বিবেককে চাবুক মেরে জাগাবার জন্যে জালিয়ানওয়ালাবাগেরই প্রয়োজন ছিল। মাইকেল এডওয়ার্ডস'এর ভাষায়—"The affair at the Jallianwalla Bagh certainly had a moral effect···The last years of British India were ushered in to the sound of General Dyer's guns."

জেনারেল ডায়ারের গুলির শব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে ভগৎ সিং'এর কানে। অমৃতসরের রক্তাক্ত মাটি স্পর্শ করে সে প্রতিজ্ঞা করেছে—বলিদান, দেশমাতৃকার পায়ে দেশের শৃংখল মোচনের জন্য আত্মবলিদানের প্রতিজ্ঞা। সেই রক্তরঞ্জিত মৃত্তিকার কিছুটা সঞ্চয় করে বোতলে পুরে সে নিয়ে এসেছে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেছে—যেন না ভুলি, কখনও যেন না ভুলি।

কংগ্রেসে এই সময়ে বামপন্থী নেতাদের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিলো। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতিলাল নেহরুর মত নেতাদের প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠা গান্ধীর পক্ষে সহজ ছিল না। ১৯২০ সালে গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলনের

ডাক দিলেন, তখন সকলেই গান্ধীকে নেতা বলে মেনে নিয়ে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধী অন্ততঃ এমন একটি অস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন, যার ব্যবহারে সারা দেশের সাধারণ মানুষ এক হতে পেরেছিল। এই অস্ত্র হল অসহযোগ। সেদিন যেন পলকে ছড়িয়ে গেল চারিদিকে—না, এই সরকারের সংগে আর সহযোগিতা নয়। বর্জন করো ওদের দেওয়া অনুগ্রহ, বন্ধ করো অফিস-কাছারি, ছেড়ে দাও ওদের স্কুল-কলেজ···। কেউ কেউ আপত্তি করেছিল স্কুল কলেজ বয়কট করার ব্যাপারে। উত্তরে গান্ধী বলেন—Eduation can wait, freedom cannot. সেদিন অন্যান্যদের সংগে ভগৎ সিংও ছেড়ে এলো স্কুল। তখন মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র সে। ভগৎ সিং আর তার সহপাঠী বন্ধু জয়দেব গুপ্ত।

বিদেশী স্কুলের শিক্ষা বর্জন করে সেদিন জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতীয় শিক্ষায়তন গড়ে তুলেছিলেন। লাহোরেও ন্যাশনাল কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লালা লাজপত রায় ও ভাই পরমানন্দ। কিন্তু ভগৎ তো স্কুলেব শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি। কলেজে সে কেমন করে পড়বে ?

ভগৎ সিং আর জয়দেব গুপ্ত দু'জনে সারারাত ধরে শুধু পড়াশোনা করে দু'মাসে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। কাজেই তারপরে আর কলেজে ভর্তি হতে বাধা রইলো না।

এই ন্যাশনাল কলেজেই ভগৎ সিং'এর সংগে বন্ধুত্ব হলো ভগবতীচরণ ভোরা ও শুকদেবের। যোগাযোগ ঘটলো যশপাল, রামকৃষ্ণ তীরথরামের। ভগবতীচরণ ও তাঁর স্ত্রী দুর্গা দেবীর বন্ধুত্ব ভগৎ সিং'এর জীবনে এক অমূল্য সম্পদ। এই ন্যাশনাল কলেজেই ভগৎ সিং'এর রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ।

কলেজে পড়াতে আসতেন জাতীয়তাবাদী নেতারা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—লালা লাজপত রায়, পরমানন্দ, জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার প্রভৃতি ব্যক্তিরা। তাঁরা চেষ্টা করতেন ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তার বোধ সৃষ্টি করতে। জাতীয় ঐতিহ্যকে তাদের সামনে তুলে ধরে পরাধীনতার গ্লানিকে প্রকট করে তুলতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। এ'দের মধ্যে ইতিহাস পড়াতেন জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার। জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার পৃথিবীর জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের

কাহিনী ও কারণগুলি বিশ্লেষণ করতেন। তিনি নিজেও পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী নেতাদের সান্নিধ্য পেয়েছেন। কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই জয়চন্দ্রর কাছেই ভগৎ সিং তাঁর চিন্তার স্ফুরণ পেলেন। ভারতের ইতিহাস পড়ে সচেতন হলেন এবং প্রেরণা পেলেন জাতীয় আন্দোলনের। ভগৎ সিং অনুভব করলেন একক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা আসে না, তার জন্য চাই ব্যাপক প্রস্তুতি, চাই সাধারণ মানুষের জাগরণ। এই জয়চন্দ্রই ভগৎ সিং'এর জীবনে রাজনীতির দীক্ষা-গুরু।

ছাত্র হিসেবে ভগৎ সিং অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ইতিহাস ও রাজনীতিতেই তিনি আনন্দ পেতেন বেশী। ক্লাসের বক্তৃতায় তিনি খুশী হতেন না। তাই বাইরেও কখনও শিক্ষকের সংগে কখনও বন্ধুদের সংগে তিনি আলোচনা করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তর্ক করতেন। ক্রমশঃ তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে। তিনি যে রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়ছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় পিতামহ অর্জন সিংকে ১৯২১ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠি থেকে। "... শুনতে পাচ্ছি রেলকর্মচারীরা ধর্মঘট করবে বলে ঠিক করেছে। আশা করি সামনের সপ্তাহেই তাদের ধর্মঘট শুরু হবে।"[২৩]

শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই তাঁর উৎসাহ নিবদ্ধ ছিল না। ভগৎ ভালো গান গাইতে পারতেন। তিনি দেশপ্রেমমূলক সংগীতই পছন্দ করতেন। তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেতো সেই সব গান যেগুলি প্রিয় ছিল গদর বিপ্লবের তরুণ শহীদ কর্তার সিং সরোবার। তিনি গাইতেন—'সেবা দেশ দি জিন্দারিয়ে বড়ি ঔখি' অথবা 'চলো চলিয়ে দেশ নু উদ্ করনে/এহো আখীর বচন ফরমান হো গ্যয়ে।' (এবারে আদেশ এসেছে : এখন চলো, দেশে ফিরে যাই যুদ্ধ করতে।) সরোবার ডাক যেন শুনতে পেয়েছিলেন ভগৎ। এবারে ডাক এসেছে—দেশের ডাক।

নাটক ও অভিনয়েও ভগতের প্রচণ্ড উৎসাহ। লাহোরের ন্যাশনাল ড্রামাটিক ক্লাবের তিনিই মধ্যমণি। ন্যাশনাল ক্লাবের প্রত্যেকটি নাটকাভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। একবার তাঁরা 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য)' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। ভগৎ অভিনয় করলেন শশীগুপ্তের চরিত্রে। নাটকটির অভিনয়ে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ও সহপাঠীরা ভগতের অভিনয় সাফল্যে তাকে অভিনন্দিত করে। ভাই

পরমানন্দ সেই দিনই ভবিষ্যৎ বাণী করলেন যে, আমার ভগৎ এ যুগের শশীগুপ্তই হবে।

ন্যাশনাল ক্লাব জাতীয়তার উদ্বোধক ও দেশপ্রেমমূলক নাটকই মঞ্চস্থ করতো। ভগৎ সিং তাদের 'রাণাপ্রতাপ' ও অন্যান্য বইতেও অভিনয় করেন। কিন্তু ন্যাশনাল ক্লাবের ওপর সরকারী দৃষ্টি পড়ায় ক্লাবটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে ভগৎ এফ. এ পাস করে বি এ. ক্লাসে ওঠেন।

১৯২২ সালের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার-ভাটায় আলোড়িত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে গোটা ভারতবর্ষ তাঁর পায়ের তলায় সমবেত হয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই ১৯২২ সালে হঠাৎ চৌরীচৌরার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। বলা বাহুল্য এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করার অধিকার তাঁর ছিল না। তিনি কারও অভিমতের অপেক্ষা করেন নি। এক বছর আগে যাঁদের কাছে তিনি করজোড়ে বলেছিলেন—'আমায় একবার সুযোগ দিন—' তাদেরই পিঠের ওপর তিনি ছুরি বসালেন। গান্ধীজীর এই ব্যবহারে শুধু যে বিপ্লবী তরুণেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিল, তাই নয়, দেশবন্ধুর মত বিজ্ঞ রাজনীতিকও হতাশ হয়েছিলেন।

১৯২২'এর ব্যর্থতা ভারতের সর্বত্র বিপ্লবীদের ওপর ছায়াপাত করেছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, গান্ধীর নেতৃত্বে আর নির্ভর করা যায় না। ১৯২৩ সালের দিল্লী অধিবেশনে কংগ্রেসী নেতারা যখন মিলিত হলেন, তখনই চরমপন্থী নেতারা মিলিত হয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—বিপিন গাঙ্গুলি, শচীন সান্যাল, রামপ্রসাদ বিসমিল প্রভৃতি।[১৪]

ভগৎ সিংও রাজনৈতিক পটভূমিকার এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ততদিনে স্থির করে রেখেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে। বিদেশী শাসনে নির্যাতিত দেশের মানুষ তো জীবন নিয়ে বিলাসিতা করতে পারে না। তার রাজনীতি মাত্র একটিই—যে কোন উপায়ে দেশ থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো।

ভগতের বুকে সরোবার ফোটো, আর জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তসিক্ত মৃত্তিকা। পারিবারিক স্নেহ প্রীতি কর্তব্য সবকিছুর ওপরে তাঁর দেশ।

কিন্তু স্নেহ যে অন্ধ। তাই অর্জন সিং'এর স্ত্রী জয় কাউর যাঁর একপুত্র অজিত সিং অজানা পরিবেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করছে, তিনি তাঁর প্রথম নাতি[২৫] ভগতের বিয়ে দেওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর জেদে—কিষাণ সিং সম্বন্ধ স্থির করলেন। কিন্তু বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ভগৎ ইতিমধ্যেই তার কর্তব্য স্থির করে রেখেছে। তাই সে চিঠি লিখলো তার বাবাকে—

"......এখন কি বিয়ে করার সময়? আমার দেশ যে আমায় ডাকছে। আমি যে আমার সব—শরীর, মন ও আত্মা—নিবেদন করেছি দেশের কাজে। তোমার কাছে নতুন করে কি বলবো? আমাদের বংশে দেশের জন্যে সকলেই যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। জন্মের দু'তিন বছরের মধ্যে এক কাকা পুলিসের অত্যাচারে মারা গেছেন। আর এক কাকা বিদেশে বিদেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তুমি নিজেও তো কত নির্যাতনই না ভোগ করেছো। আমি তো তোমাদের পায়ের ছাপ ধরেই এগিয়ে চলেছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো বাবা। বিয়ের কথা আর তুলো না।"

ভগতের চিঠি তাঁর বাড়িতে যেন বজ্রপাতের মতই নিদারুণ হয়ে দেখা দিল। বৃদ্ধা পিতামহী জয় কাউর তখনও জেদ ধরে আছেন—ভগতের বিয়ে দিতেই হবে। মায়ের ইচ্ছার প্রবলতা কিষাণ সিংহকে ব্যস্ত করে তুললো। স্নেহপ্রবণ পিতা নিজেও চাচ্ছিলেন না যে বংশে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটুক। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি কঠিন হতে চাইলেন। ভগৎকে জানালেন যে, বৃদ্ধা মায়ের বাসনাকে তিনি অপূর্ণ রাখতে চান না। জানালেন যে, বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। ভগৎ যেন আর আপত্তি না করে।

উত্তরে তিনি চিঠি পেলেন ছেলের কাছ থেকে—

"বাবা,

তোমার চিঠি পেয়ে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছি। তোমাকে যে আমি দেশপ্রেমিক নির্ভীক লোক বলেই জানি। তুমিও যদি এত তুচ্ছ ব্যাপারে এমন ব্যস্ত হও, তবে অন্য লোকে কি করবে জানি না। তুমি কেবল দাদীর কথাই ভাবছো। কিন্তু আমাদের এই তেত্রিশ কোটি সন্তানের যিনি জননী, সেই দেশমাতার কথা তো ভাবছো না! তাঁর শৃঙ্খল মোচনের জন্যে যে আমাদের সবকিছু বিসর্জন দিতে হবে।

আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার ওপর জোর করবে। তাই আমি চলে যাচ্ছি—অন্য কোনখানে।"

লাহোর ছেড়ে ভগৎ সিং চলে গেলেন। ছেড়ে দিলেন কলেজ। সরোবার মত তিনি ডাক শুনেছেন মৃত্যুর। বন্ধুদের কাছে বলে গেলেন—পরাধীন ভারতে যদি আমাকে বিয়ে করতে হয়, তবে সে বিয়ে হবে শুধু মৃত্যুর সঙ্গে। আমার বাসরশয্যা পাতা হবে শহীদের শবযাত্রার মিছিলে।

ভগৎ সিং যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহিত হতে বাধ্য করবেন, তখন তিনি নিরুপায় হয়ে জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের কাছে গেলেন। জয়চন্দ্র শুধু জাতীয়তাবাদী ও নির্ভীকচিত্ত পুরুষ ছিলেন তাই নয়, তিনি উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীনেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বন্ধু ছিলেন এবং বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। ভগৎ সিং তাঁর ছাত্র, এবং বিপ্লবমন্ত্রে তাঁর দ্বারাই দীক্ষিত।

শচীন সান্যাল ঠিক এই সময়েই হঠাৎ লাহোরে এসে পৌঁছোলেন। সারা ভারতে বিপ্লবীদের একটি ব্যাপক সংস্থা গড়ে তুলবার প্রেরণায় তিনি তখন ঘুরছেন। জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার ভগৎকে শচীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে এলেন। শচীন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি আমাদের এই মাতৃভূমির জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারবে?

ভগৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—নিশ্চয়ই।

—যদি দেশের জন্যে বাড়ি ছাড়তে হয়?

—ছাড়বো।

—যদি বাপ মা আত্মীয়স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করতে হয়?

ভগৎ বললেন—দেশের জন্যে সবকিছু ছাড়তে পারি; আর আমার যা আছে, এই জীবন মন প্রাণ সবই দিতে পারি।

—কিন্তু দেশসেবার কোন পুরস্কার নেই, নির্যাতন ছাড়া।

ভগতের মুখের স্থির অথচ দৃঢ় হাসি দেখে শচীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি তখনই বুঝতে পেরেছিল যে, এই প্রায় বালকের মত যুবকের মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব আছে যা ভবিষ্যতে অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠবে।

শচীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি দিলেন। তখন কানপুরে এসে উঠেছেন

অনুশীলন দলের যোগেশ চ্যাটার্জী, পার্টির সংগঠনের কাজ করছেন সেখানে বসে। তাঁরই কাছে পাঠিয়ে দিলেন ভগৎকে।

যোগেশ চ্যাটার্জী তাঁর আত্মজীবনীতে[২৬] লিখেছেন—"একদিন দিনের বেলায় সান্যালবাবুর চিঠি নিয়ে ভগৎ সিং এসে পোঁছোলো। আমরা কথা বললাম, কিন্তু তখন ভাবছি যে রাত্রে তাকে কোথায় রাখা যায়। আমি নিজে বাঙালী মেসে থাকি। সেখানে হঠাৎ এক শিখ যুবকের উপস্থিতি পুলিসের চোখে পড়তে পারে। কিন্তু উপায় না থাকায় সেই মেসেই তাকে রাখতে হল।

"স্টেশনে নেমে ভগৎ তার বাক্স বিছানা একটা ধর্মশালায় রেখে এসেছিল। ভগৎকে নিয়ে আমি সেগুলি আনতে গেলাম। কিন্তু সেই ধর্মশালাটা সে আর খুঁজে পেলো না। অনেক ঘোরাঘুরি করে রাত প্রায় দশটার সময় আমরা ধর্মশালাটার খোঁজ পেলাম আর জিনিসপত্রগুলো আমাদের পাটকাপুর মেসে নিয়ে এলাম। সে আমার সেই পাটকাপুর মেসেই থেকে গেল।"

যোগেশ চ্যাটার্জী ভগতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তরুণ ভগতের ব্যক্তিত্বকে বোঝা সহজ হবে। যোগেশবাবু লিখছেন—"তখন বয়স তার মাত্র সতেরো কিন্তু সেই বয়সেই সারা মুখে দাড়ি। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, সব সময়েই কৌতূহল। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি, কি ধরনের বিপ্লব আমাদের দেশে সফল হতে পারে। রাশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্য ও সাম্যবাদও আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল। ভগতের কৌতূহল কিছুতেই মিটতো না। সে কোন বিষয়ই বিনা তর্কে গ্রহণ করতো না।"

এই সময়ে জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার হঠাৎ একদিন কানপুরে এলেন। এবং ভগৎকে গণেশশংকর বিদ্যার্থীর সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন। যোগেশ চ্যাটার্জীর বাঙালী মেসে ভগতের অবস্থান নানাদিক থেকে অসুবিধাজনক ছিল। গণেশশংকর বিদ্যার্থীই তাঁকে 'প্রতাপ' প্রেসে একটি ঘর দিলেন থাকবার জন্যে।

বিদ্যার্থীজী কানপুরে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বাধীনচিত্ত ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। কানপুরে তিনি এই প্রেসটি চালাতেন এবং দেশসেবামূলক প্রতিটি কাজের সংগে যোগাযোগ রেখে চলতেন। কানপুরে বিদ্যার্থীর 'প্রতাপ' প্রেসই উত্তর প্রদেশ (তখন যুক্ত প্রদেশ) বিপ্লবীদের মিলনের একটি কেন্দ্র ছিল।

ভগৎ সিং'এর সঙ্গে বিদ্যার্থীজীর প্রথম আলাপের একটি ছবি আমরা জি এস. দেওল'এর গ্রন্থে পাই। বিদ্যার্থী তাঁকে বলেন—দেখো, স্বাধীনতার সৈনিক কি রকম জানো ? সে হলো একটা পতঙ্গ, যে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে।

ভগৎ উত্তর দিলেন—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, দেশের জন্যে প্রাণ দেবো।

বিদ্যার্থী—সৈনিক হতে হলে তাকে সমস্ত প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

ভগৎ সিং বিদ্যার্থীর চরণ স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাতৃভূমির সৈনিক। দেশের কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রলোভনে তাঁর মন ভুলবে না।

কানপুরের অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুল নানাভাবে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই স্কুলের ছাত্রদেব মধ্যে অনেকেই পরে বিপ্লবাত্মক কাজে লিপ্ত হয় এবং হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করে। এই ছাত্ররা তখন পাটকাপুর মেসে আসতো, এবং বিদ্যার্থীর প্রতাপ প্রেসেও মিলিত হতো। সম্ভবতঃ এই প্রতাপ প্রেসের আড্ডাতেই ভগৎ সিং'এর সঙ্গে যোগাযোগ হয় এদের কয়েকজনের—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজয়কুমার সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্ত'র নাম। এ ছাড়া এখানেই ভগৎ সিং পবিচিত হন চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে। উল্লিখিত বন্ধুদেব সঙ্গে ভগৎ হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন।

'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' বিপ্লবীদের একটি সর্ব-ভাবতীয় সংস্থা। ১৯২৩ সালে দিল্লীতেই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এমন একটি সর্বভারতীয় সংস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ বিপ্লবী সংগঠনের নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালের চেষ্টায় এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমর্থনে ১৯২৪ সালের শেষের দিকে এই সংস্থার সৃষ্টি হয়। অ্যাসোসিয়েশন তার ঘোষণা পত্রে লেখে যে, এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সুসংহত সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।...এই প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি হবে সাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের পরিচালনা এবং মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ ও বৈষম্যমূলক পদ্ধতিগুলিব অবসান ঘটানো।

কর্মসূচীর মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন দুই প্রকার প্রোগ্রাম থাকে প্রকাশ্য কাজ হবে ক্লাব লাইব্রেরি ও সেবাসমিতি সংগঠন, কৃষক-মজুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা, ভাবের আদান-প্রদানের জন্য পত্রিকা বার করা ইত্যাদি।

আর গোপন কাজ—বিপ্লবাত্মক পুস্তিকার প্রকাশ ও বিতরণ, অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং একটি সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি করা।[২৭]

অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল নিজে, সূর্য সেন (মাস্টার দা), যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, রামপ্রসাদ বিসমিল, শচীন্দ্রনাথ বক্‌শি, রাজেন লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর আজাদ, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল ও আরও অনেকে।

ভগৎ সিং দলের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা রচনা করে সেগুলি বিতরণের ভার নিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠিক একই সময়ে কলকাতায় শচীন সান্যালের সহকারীরূপে তরুণ যতীন দাসও অনুরূপ কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন। ভগৎ এই সময় যে সব পুস্তিকা ও ইস্তাহার লিখে গোপনে ছাপেন, তার মধ্যে একটিব শিরোনাম ছিল—জাগো মেরে দেশকে লোকো···আমার দেশবাসী তোমরা জাগো। একবার প্রতাপগড়ের দশেরা মেলায় এই ইস্তাহার বিলি করবার সময় ভগতের দুই সঙ্গীকে সাদা পোশাকের পুলিস ধরে। ভগৎ তখনই মেলার আর একধারে একগাদা ইস্তাহার ছড়িয়ে—কংগ্রেসের লোক, এই চিৎকাব তোলেন। ফলে সকলে সেদিকে দৌড়ে যান, আর সেই ফাঁকে ভগৎ আর তাঁর সঙ্গীরা উধাও হন।

কানপুরে দলের সদস্যদের তেমন কোন আর্থিক সংগতি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ভগতের সামনে একটি সুযোগ আসে। আলিগড়ের কাছে ঠাকুর টোডড় সিং নামের এক ব্যক্তি একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গণেশশংকর বিদ্যাথীর চেষ্টায় ভগৎ সেই বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার হন।[২৮] যতদূর জানা যায়, ভগৎ যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন।

১৯২৪'এর অক্টোবরে উত্তর প্রদেশের বন্যায় ভগৎ সেবাদল গঠন করেন ও বন্যাত্রাণে আত্মনিয়োগ করেন। কানপুরে ভগৎ অল্পদিনেই সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

।। সাত ।।

ভগৎ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় তাঁর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনেরা, বিশেষ করে তাঁর মা বিদ্যাবতী ও ঠাকুমা জয় কাউর অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ঠাকুমা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর পূর্বে একবার নাতিকে দেখতে চান।

সৌভাগ্যক্রমে ভগতের বাল্যবন্ধু জয়দেব গুপ্ত তাঁদের আর এক বন্ধু রামচাঁদের কাছ থেকে ভগতের ঠিকানা জানতে পারেন। তাঁরা দু'জনেই তখনই কানপুর চলে আসেন এবং বিদ্যার্থীজীকে ভগৎ সিং'এর ঠাকুমার অবস্থা জানান। জয়দেব গুপ্তের অনুরোধে কিষাণ সিং'ও একটি চিঠি লিখে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভগৎ ফিরে এলে তাকে বিয়ের কথা আর কেউ বলবে না। অবশেষে ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে ভগৎ বাড়ি ফিরে গেলেন।

ফিরে এসেই ভগৎ আর একটি ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন। পাঞ্জাবে তখন গুরুদ্বারের মোহান্তদের বিরুদ্ধে অকালী আন্দোলন শুরু হয়েছে। চরিত্রহীন ও অর্থলোভী মোহান্তদের সরিয়ে গুরুদ্বারে সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাঠ শিখদের এই আন্দোলন। নাভার মহারাজা রিপুদমন সিং'কে পদচ্যুত করা হলে প্রবল প্রতিবাদ ও 'জয়তু মোরচা' নাম দিয়ে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, গভর্নমেণ্ট এই আন্দোলন দমন করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি পাশবিক।

এই অকালী আন্দোলনের সংগে আর একটি আন্দোলন যুক্ত হয়েছিল। পাঞ্জাবের বিভিন্ন গুরুদ্বারে সে সময় দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিগ্রস্ত মোহান্তদের আধিপত্য। এই মোহান্তদের কাজের প্রতিবাদ করায় এবং তাদের অপসারণের জন্য আন্দোলন করায় শত শত জাঠ শিখকে হত্যা করা হয়। ১৯২২ সালের অগস্ট মাসের পর থেকে জনবিক্ষোভ 'বাব্বর অকালী আন্দোলন' নামে পাঞ্জাবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার মোহান্তদের পক্ষ নিয়ে জাঠ শিখদের দমন করতে উদ্যত হয়। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিস একদল শিখ স্বেচ্ছাসেবককে গুলি করে হত্যা করে। গভর্নমেণ্ট একটি নির্দেশনামা প্রচার করে এই অকালীদলের সংগে যুক্ত কোন স্বেচ্ছাসেবককে আশ্রয় দেওয়া বা কোনরকম সাহায্য করা নিষিদ্ধ করে দেয়।

এই সময় কিষাণ সিং খবর পেলেন যে, একজন জাঠ সত্যাগ্রহী বঙ্গা গ্রামে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো দরকার, অথচ কিষাণ সিং বিশেষ কাজে বোম্বে যাচ্ছেন। পুত্র ভগতের ওপর ভার দিলেন তিনি, যাতে অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়।

কিন্তু প্রতিরোধের মুখে দাঁড়াতে হলো ভগৎকে। সরকারের পদলেহী লোকেরা চেষ্টা করলো, যাতে সত্যাগ্রহীদের কোন অভ্যর্থনা না দেওয়া হয়। ভগৎ নিজে গ্রামে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং গ্রামবাসীদের একত্র করে সমস্ত ঘটনা বোঝালেন। ফলে জাঠ সত্যাগ্রহীরা এক অভূতপূর্ব সমাদর পেলেন বঙ্গা গ্রামে।

কিন্তু ভগতের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা বার হলো। ভগৎ গোপনে পালালেন লাহোরে। লাহোর থেকে দিল্লীতে। তাঁর শিক্ষক জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের একটা চিঠি নিয়ে তিনি দিল্লীতে 'বীর অর্জুন' পত্রিকায় চাকরি নিলেন আবার সেই 'বলবন্ত সিং' নামে।

মাস কয়েকের মধ্যেই অকালী আন্দোলন থেমে গেল। ভগৎ আবার ফিরে এলেন লাহোরে।

।। আট ।।

১৯২৫ সালের ৯ই অগস্ট ঘটলো তাঁর জীবনের একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর প্রদেশ শাখা রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে কাকোরি স্টেশনের কাছে ট্রেন থামিয়ে সরকারী টাকা লুঠ করলো। এই ডাকাতিতে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকের সংগেই ভগতের ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে। ভগতের বয়েস তখন মাত্র আঠারো।

কাকোরি ডাকাতিতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ বিসমিল ছাড়াও রাজেন লাহিড়ী, আসফাকউল্লা, রোশন সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, বনওয়ারিলাল প্রমুখ যুবকেরা ছিলেন। এঁরা ট্রেন থামিয়ে নিঃশব্দে কাজ উদ্ধার করে অদৃশ্য হন। একজন যাত্রী অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলে তাকে গুলি করে মারা হয়।

এটা যে রাজনৈতিক ডাকাতি, তা বুঝতে গভর্নমেণ্টের দেরী হয় নি। হর্টন নামে এক পুলিস অফিসার অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে সমস্ত ঘটনার

সূত্র আবিষ্কার করে, ফলে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিস তৎপরতায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ধরা পড়ে যান। বনারসীলাল ও বনওয়ারি-লালের স্বীকৃতির ফলেই শুধু ডাকাতির সূত্র নয় পুরো দলের (হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন) অস্তিত্বই পুলিস জানতে পারে। যার ফলে কলকাতা থেকে শচীন সান্যাল, কানপুর থেকে সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাশী থেকে মন্মথনাথ গুপ্ত প্রভৃতিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এই দলের সঙ্গে যতীন দাস ও ভগৎ সিং (বলবন্ত সিং নামে) যে যুক্ত, তাও পুলিস জানতে পারে। যতীন দাস দলে 'কালীবাবু' কিম্বা 'কামিনী কাকা' নামে পরিচিত ছিলেন।[২৯] বনওয়ারিলাল রাজসাক্ষী হয়ে তাঁকে সনাক্ত করতে কলকাতায় আসেন। কিন্তু চিনতে না পারায় যতীন দাসকে জড়ানো যায় নি। অথচ যতীন দাসই ডাকাতির জন্যে অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁদের অভিযুক্ত করা হয় তাঁদের সঙ্গে চট্টগ্রাম-খ্যাত সূর্য সেনও জড়িত ছিলেন, এবং এক সময়ে তিনি বন্দীদের মুক্ত করার জন্যেও চেষ্টা করেছিলেন।

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে কাকোরি মামলার শুরু হয়। এই মামলায় প্রথম ২৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। পরে এই সংখ্যা বেড়ে যায়। অভিযুক্তদের মধ্যে চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিস ধরতে পারেনি। বস্তুতঃ আজাদ মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ধরা দেন নি। ১৯৩১ সালে এলাহাবাদের অ্যালফ্রেড পার্কে লড়াই করতে করতে তিনি মারা যান।

কাকোরি মামলায় পুলিস কয়েকটি মূল্যবান দলিল পেশ করে। তার মধ্যে একটি হল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষণাপত্র ও নিয়মাবলী। দ্বিতীয়টি শচীন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা 'দি রেভোলিউশনরি' নামক পুস্তিকা।

ঘোষণাপত্রে দলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় এইভাবে—

The object of the Association shall be to establish a Federated Republic of the United States of India by an organised and armed revolution.

(সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতীয় রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করে একটি যুক্ত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করাই হবে এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য।)

'দি রেভোলিউশনরি' পুস্তিকায় বলা হয়—"নতুন নক্ষত্রের জন্মের

মুহূর্তে যেমন চরম বিশৃংখলা জাগে, জীবনের সৃষ্টিও তেমনই বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয়। ভারতবর্ষও নতুন করে জন্ম নিতে চলেছে এবং সেই অবশ্যম্ভাবী অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে যে অবস্থায় বিশৃংখলা ও যন্ত্রণার সৃষ্টিই স্বাভাবিক। ..."

এই পুস্তিকাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে হত্যা ধ্বংস ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, এবং বলা হয় "The official terrorism is surely to be met by counter-terrorism." (সরকারী সন্ত্রাস সৃষ্টিকে সন্ত্রাসবাদের দ্বারাই প্রতিরোধ করা হবে)।

এগুলি যেন ভগৎ সিং'এর হৃদয়ের কথা। তিনি বুকের রক্ত দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করার পথে এগিয়েছিলেন। যদিও অপরাধীদের তালিকায় তাঁর নাম ছিল না (হয়ত সেজন্যে তিনি মনে মনে সংকুচিত ছিলেন), ভগৎ সিং প্রতিদিন কোর্টে হাজির থাকতেন। পরম আগ্রহে তিনি শুনতেন। মামলার অন্যতম আসামী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী তাঁর 'ইন সার্চ অব্ ফ্রিডম' গ্রন্থে (পৃঃ ৩২৪) ভগৎ সিং'এর উল্লেখ করে বলেছেন—"লক্ষ্ণৌর নিচের আদালতে যখন মামলা চলছিল, তখনকার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সর্দার ভগৎ সিং'এর উপস্থিতি। কাইজারবাগে রোশনুদ্দৌলা কোর্টে যাওয়ার পথে আমাদের বাস যখন অ্যাবট রোড থেকে ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডে ঘুরলো, তখন দেখি ভগৎ সিং দুটি রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কোর্টের মধ্যে আমরা যখন কাঠগড়ার ভেতরে গিয়ে আসন নিলাম, ভগৎ সিংও অন্যান্য দর্শকের সঙ্গে ভেতরে এসে আমাদের কাছাকাছি বসলো। তখন পর্যন্ত বেশভূষায় সে পুরোপুরি শিখ। তার পরিধানে যোধপুরী ব্রিচেজ, আর মাথায় চিত্রিত পাগড়ি। সারাদিন সে নিঃশব্দে বসে রইলো; তার মুখে স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি। তার পাশেই পুলিস, সি আই ডি. অফিসার এবং তাদের পোষা ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব—সকলেই ছিলেন, কিন্তু সেদিন সম্ভবতঃ কেউই এই সুদর্শন ও সুবেশ শিখ যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখেননি।"

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার মূল চারজন আসামীকে—রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রাজেন লাহিড়ী ও রোশন সিং—মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যদেরও কঠোর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই সময় শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে জেল থেকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা করা হয়। যোগেশ চ্যাটার্জীকে ট্রেনের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার এই প্রচেষ্টায়

চন্দ্রশেখর আজাদ, বিজয়কুমার সিংহ, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু ও শিব বর্মার সঙ্গে ভগৎ সিংও কানপুরে যান। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তাঁরা শোনেন যে, আগের ট্রেনেই তাঁকে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।[৩০]

এই ব্যর্থতা ভগৎ সিং'এর বুকে এতই বাজে যে, তিনি কেঁদে ফেলেন।[৩১]

কিশোর ভগৎ তখন দেখছেন, কিভাবে শাসনের পেষণ-যন্ত্র বিপ্লবী নেতাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, বিপ্লবের সার্থকতা অনেক, অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

।। নয় ।।

নওজোয়ান ভারত সভা :

কাকোরি মামলার রায়ে গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করলো সারা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের ধারাকে ধ্বংস করে দিতে। তাই কঠোরতম দণ্ড দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি গভর্নমেণ্টের এজেণ্ট—বিচারপতি হ্যামিলটন। আঠারো বছরের যুবক ভগৎ সিং দিনের পর দিন কোর্টে বিচারের প্রহসন দেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অসহায় যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২৬ সাল অত্যন্ত অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার সময়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে কংগ্রেসের প্রগতিশীল মনোভাব তখন স্তব্ধ। গান্ধীজী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে চরখা ও সর্বোদয়'এর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। গভর্নমেণ্ট নির্বিকার চিত্তে এবং নির্দ্বিধায় বিপ্লব আন্দোলন দমনের কাজে সচেষ্ট। শুধু যুবসম্প্রদায়ের কিছু অংশ তখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

ব্রিটিশ শাসনের কঠোরতা এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অসহায় নীরবতা সমগ্র দেশের যুবচিত্তে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় যতীন্দ্রনাথ দাস যেমন 'তরুণ সমিতি'র মাধ্যমে যুবকদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করছিলেন, লাহোরেও এই অসহিষ্ণু ও উদ্দাম যুবচিত্তকে সংঘবদ্ধ করে সংগঠনের মধ্যে আনার জন্যে চেষ্টা করা হল। আর এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী হলেন সর্দার ভগৎ সিং।

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন কার্যতঃ বিধ্বস্ত। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের বিপ্লবের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কিছু

একটা করার চেষ্টা করতে লাগলেন ভগৎ সিং। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে সৃষ্টি হল 'নওজোয়ান ভারত সভা'। সভাপতি রামকৃষণ, সম্পাদক ভগৎ সিং। উদ্দেশ্যরূপে সামনে যে কর্মসূচী রাখা হল তা হলঃ নৈতিক উন্নয়ন, সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে আলোচনা, সভ্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব সৃষ্টি, শরীর উন্নয়নের চেষ্টা, এবং ভারতীয় সাহিত্যে ও ঐতিহ্যে অনুরাগ সৃষ্টি। সভ্য হতে হলে প্রত্যেককে শপথ গ্রহণ করতে হত যে, সে সম্প্রদায় বা ধর্মের ওপর জাতীয় স্বার্থকে গণ্য করবে।

আসলে এগুলি ছিল বহিরঙ্গ। 'সভা'র গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলঃ

(১) সারা ভারতের শ্রমিক ও কৃষককে একত্র করে এক সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

(২) জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করা, এবং দেশের যুবচিত্তে দেশপ্রেমের বীজ বপন করা।

(৩) 'সভা'র আদর্শের অনুকূল এবং সাম্প্রদায়িকতার ভাবমুক্ত সমাজোন্নয়ন এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথে যে কোন আন্দোলনের সহায়তা করা।

(৪) কৃষক ও মজুরকে সংগঠিত করা।[৩২]

'নওজোয়ান সভা'র এই উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি থেকে বোঝা যায় যে, কিশোর ভগতের ওপর সাম্যবাদী ভাবধারার প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্য পৃথিবীর বিপ্লবকামী সকল মানুষকেই সেদিন কিছু না কিছু প্রেরণা দিয়েছিল। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালও লেনিনের সাফল্য ও চিন্তাধারায় মুগ্ধ হয়ে সাপ্তাহিক 'শঙ্খ'তে লেনিন সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। ছাত্র অবস্থায় ভগৎও রাশিয়ান বিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। কাজেই সাম্যবাদের প্রেরণা তাঁর মধ্যে কার্যকরী হয়েছিল এ প্রমাণ সুস্পষ্ট।

'নওজোয়ান ভারত সভা' ও ভগৎ সিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুজাফ্ফর আহমদ লেখেন—"মীর আবদুল মজিদ'এর বাড়িতে আমি প্রথম যাঁকে দেখেছিলেম, তিনি ছিলেন একজন শিখ নবযুবক। লম্বা চুলের ওপর মাথায় যত্ন করে পাগড়ি বাঁধা, পাতলা দাড়ি তখনও পুরো চেহারা ঢেকে ফেলেনি, পরনে পায়জামা শার্ট ও কোট, মিষ্ট স্বভাবের এই ভগৎ সিং'এর ছবিই আমার মনে ছাপা হয়ে আছে।

"আমার লাহোর যাওয়ার আগে ত' নিশ্চয়ই, কিন্তু কতদিন আগে তা মনে নেই, সেখানে 'নওজোয়ান ভারত সভা' গঠিত হয়েছিল। বাইরে থেকে সেদিন আমি যা বুঝেছিলেম, উদ্যোক্তাদের ভিতরে সকল মতের ও সকল পথের লোকেরা ছিলেন। তাতে ন্যাশনালিস্টরা ছিলেন, কমিউনিস্টরা ছিলেন, আর ভগৎ সিং ও তাঁর বন্ধুরাও ছিলেন। তার মানে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও ছিলেন 'নওজোয়ান ভারত সভা'য়।"৩৩

'সভা'র প্রভাব সেদিন সমস্ত পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাখা স্থাপিত হয়েছিল—লাহোর, অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, সারগোদা, শিয়ালকোট, এমন কি করাচী ও পেশোয়ারেও। সভার সংগঠকদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় ভগবতীচরণ ভোরার। ন্যাশনাল কলেজে ভগৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে পান ভগবতীচরণকে। নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠ ও অক্লান্তকর্মী এই মানুষটির অসাধারণ প্রভাব ছিল ভগৎ সিং'এর জীবনে। মুজাফ্ফর আহমদ বলেন—"ভগৎ সিং তখন ভগবতীচরণ বোহারার (?) রাজনীতিক প্রেরণায় চলতেন।"

নওজোয়ান ভারত সভার ঘোষণাপত্র ঃ

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে নওজোয়ান ভারত সভার একটি ঘোষণা পত্র প্রচার করেন প্রচার সম্পাদক ভগবতীচরণ ভোরা। ঘোষণাপত্রে বলা হয়—

আমাদের দেশ এক চরম বিশৃংখলার পথে চলেছে। সর্বত্রই অবিশ্বাস ও হতাশার ভাব প্রবল। দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত, এবং তাঁদের অনেকেই সাধারণ মানুষের আস্থাভাজন আর নন। স্বাধীনতার প্রবক্তা যাঁরা, তাঁদের সামনে আজ আর কোন কর্মসূচী নেই। সর্বত্রই চরম নৈরাশ্য। কিন্তু কোন একটি জাতির পুনরুত্থানের পথে বিশৃংখলার সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এমন চরম বিশৃংখলার দিনেই যাঁরা কর্মী ও সেবক, তাঁদের নিষ্ঠার, প্রমাণ স্বীকৃত হয়; তাঁদের চরিত্র সুদৃঢ় হয়ে ওঠে, এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণের ভূমিকা সৃষ্টি হয়। এমন একটি অবস্থাতেই জীবনীশক্তি নতুন আশা, বিশ্বাস ও উৎসাহে জেগে ওঠে; নতুন করে কাজ শুরু হয়।

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এক নবযুগের দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়েছি। একদা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রশস্তিতে যে জয়ধ্বনির মহড়া চলতো, এখন তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আর সেই ঐতিহাসিক

প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না যে, তুমি অসির দ্বারা শাসিত হবে, না মসির দ্বারা? যারা এই প্রশ্ন করেছিল, তারাই এর উত্তর দিয়েছে। লর্ড বার্কেনহেড'এর ভাষায়—'আমরা তরবারির দ্বারা ভারত জয় করেছি, তরবারির দ্বারাই তাকে অধীনে রাখবো।' জালিয়ানওয়ালা বাগ'এর ঘটনার পর আর একথার পুনরুক্তি করার দরকার হয় না যে, সুশাসন কখনও স্বশাসনের অভাব পূর্ণ করতে পারে না।

আজও কি একথা চিৎকার করে বলে বোঝাবার দরকার আছে যে, আমরা পরাধীন, আমাদের মুক্তি অর্জন করতে হবে? আমরা কি অনির্দিষ্ট কাল ধরে অপেক্ষা করবো, যতদিন না আমাদের চেতনা জাগে যে, আমরা অত্যাচারিত? আমরা কি কেবল চেয়ে থাকবো, যদি ঈশ্বর কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের বন্ধন মোচন করেন? স্বাধীনতার মৌলিক নীতি-গুলিও কি আমরা জানবো না? যারা মুক্তি পেতে চায় তাদেরকে আঘাত করতেই হবে। হে আমাদের তরুণ বন্ধুরা, আমরা অনেক ঘুমিয়েছি; এবার ওঠো, জাগো।

তরুণ বন্ধুদের কাছেই আমাদের এই আবেদন, কারণ তরুণরাই চিরকাল নির্ভীক ও আদর্শপ্রবণ হয়ে থাকে। তরুণদলই অমানবিক নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করে দ্বিধাহীনচিত্তে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে পারে। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস তরুণ প্রাণের রক্তেই লেখা হয়েছে। তাই যারা ভয় পেতে জানে না, ত্যাগ ও নির্যাতনের জীবনে যারা অভীক, যারা দুর্জয় প্রেরণায় রাষ্ট্র ও সমাজের সংস্কার সাধন করতে পারে, তাদের কাছেই আমাদের আবেদন।

(We want people who may be prepared to fight without hope, without fear and without hesitation and may be willing to die unhonoured, unwept and unsung.)

আমরা এমন মানুষ চাই যারা মনে কোন আশা পোষণ না করে, নির্ভয়ে এবং নির্দ্বিধায় মৃত্যুবরণ করতে অগ্রসর হবে এবং এ কথা জেনেই এগিয়ে যাবে যে, তাদের মৃত্যুতে গৌরবের জয়ধ্বনি উঠবে না, মানুষ হয়তো তাদের জন্য অশ্রুপাতও করবে না।

অন্তরের প্রেরণা ছাড়া আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের দ্বিমুখী সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। দ্বিমুখী লড়াই এই জন্যে যে, বহিঃশত্রু

ছাড়াও রয়েছে ভেতরের শত্রু। আমাদের অক্ষমতার কথাও মনে রাখতে হবে। বিদেশী শত্রুর দল আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আমাদের শোষণ করে চলেছে।

নতুন আদর্শ সামনে রেখে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী তৈরী করতে হবে। সে আদর্শ হল, সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত এক বিপ্লব। যে বিপ্লবের ফল হবে সকল মানুষের স্বরাজ। আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে হাজার হাজার তরুণ প্রাণকে বলিদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গিয়ে তারা মানুষকে বোঝাবে ভারতের স্বাধীনতার অর্থ কি? তাদের জানাতে হবে যে, স্বাধীনতার অর্থ রাষ্ট্রের হাতবদল নয়, স্বাধীনতার দ্বারা নতুন একটি যুগ সূচিত হবে। একাজ দু'দিন বা দু'মাসে সম্ভব হবার নয়। এর জন্য যুগ যুগ ধরে অসীম আত্মত্যাগের পথে এগোতে হবে। বিপ্লব শব্দের অর্থ বোমা বা রিভলভার নয়; আদর্শের জন্য ত্যাগ ও নির্যাতনের জীবন বরণ করাকেই বলে বিপ্লবের সাধনা। বিপ্লবের পথে অনেক দুঃখ, অনেক বাধা আসবে। হয়তো দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে সাধনা। তবু সংকল্পে অটল থেকে অতিক্রম করতে হবে পর্বতপ্রমাণ সেই বাধা। মনে রাখতে হবে যে, আত্মত্যাগ ও নির্যাতনভোগ সুনিশ্চিত ঘটনা, কিন্তু সাফল্য দৈবাৎ ঘটতে পারে।

আমাদের তরুণ বন্ধুরা আজ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠো। ভারতের স্বাধীনতাকেই জীবনের একমাত্র সাধনা বলে গ্রহণ করো। তোমাদের জীবনে হয়তো শুধু ব্যর্থতাই আসবে। হয়তো গুরু গোবিন্দ সিং'এর মত সারাজীবন প্রবল বেদনার মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। তবুও অনুতাপ করা চলবে না। দুঃখকে জেনেই দুঃখের পথে এগোতে হবে।

চারদিকে অনেক প্রবঞ্চনা; স্বার্থপর হীনচিত্ত মানুষের আনাগোনা। তারই মধ্য থেকে আমাদের বন্ধুদের বেরিয়ে আসতে হবে আপন দৃঢ়তায়। সেবা, ত্যাগ ও দুঃখভোগ হবে তাদের চিন্তা। তাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি দেশকে গড়ে তুলতে হলে অনেক রক্তপাতের প্রয়োজন হয়। "Let them remember that the making of a nation requires self-sacrifice of thousands of obscure men and women who care more for the idea of their country than for their own comfort and interest······"

।। দশ ।।

সারা ভারতবর্ষেই এইসময়ে যুবসমাজের মধ্যে নতুন করে জাগার প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশে কলকাতায় রংপুরে ও চট্টগ্রামে এর স্ফুরণ দেখা গিয়েছে। কলকাতায় 'তরুণ সংঘ' ও 'যুব সমিতি'র মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে। কংগ্রেসের মধ্যেও রিভোলটিং গ্রুপ ১৯২৮ সালের কলকাতা অধিবেশনে নিজেদের অস্তিত্বকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, যতীন দাস, বিনয় রায়, সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতির নেতৃত্বে এই যুবসমিতি ও রিভোলটিং গ্রুপের সৃষ্টি। পাঞ্জাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ ভোরা, কেদারনাথ সেগল, এম এ. মজিদ'এর মত তরুণের দল। এই নওজোয়ান ভারত সভা যে গোপনে বিপ্লবীদলের জন্য সভ্য সংগ্রহ করা এবং গুপ্তবিপ্লবের সংগঠনকে যুবসমাজের মধ্যে প্রসারিত করার জন্যই পরিচালিত হচ্ছিল একথা বুঝতে গভর্নমেণ্টের বিলম্ব হয়নি। অজয় ঘোষ তাঁর 'ভগৎ সিং অ্যাণ্ড হিজ কমরেডস' পুস্তিকায় একথা স্বীকার করেছেন—Bhagat Singh was in the meantime active in Punjab. He and his comrades had formed the 'Nawjawan Bharat Sabha,' a militant youth organisation······to preach the necessity of direct action against British rule and serve as a recruiting centre for the terrorist party.

ভগৎ সিং-এর প্রেরণায় নওজোয়ান ভারত সভা লাহোরের ব্রাডল হলে 'শহীদ দিবসের' অনুষ্ঠান করে। ভগৎ সিং এই অনুষ্ঠানে কাকোরি মামলায় দণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রোশন সিং ও রাজেন লাহিড়ীর কথা আলোচনা করেন। এই সভাতে কর্তার সিং সরোবা ও অন্যান্য বিপ্লবীর ফোটোও দেখানো হয় সিনেমা স্লাইডের সাহায্যে। ভগৎ সিং দেশের মানুষকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান।

এরপর ভগৎ সিংকে গ্রেপ্তার করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। তারা শুধু একটা অজুহাতের সন্ধানে রইল।

সুযোগ জুটে গেল। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে লাহোরে দশেরা উৎসব। উৎসবের শেষের দিকে একটি নিরীহ দর্শকের দলের ওপর কেউ বা কোন দল বোমা ফেললো। ফলে বারোজন মারা গেল, আর আহত হল ছাপান্ন জন। দোষী ব্যক্তিকে ধরতে না পেরে পুলিস বললো, এ'কাজ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের। ছল খুঁজে নিয়ে এবার তারা ভগৎ সিংকে গ্রেপ্তার করলো। প্রথমে তাঁকে লাহোর ফোর্টে আটকে রাখলো, তারপর বোর্স্টাল জেলে স্থানান্তরিত করলো। বিচার হল না, অথচ তাঁকে ছাড়াও হল না। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করাতে না পারায় ভগৎ সিংকে ষাট হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হল। এই অবস্থায় কিছুদিন কাটার পর অবশেষে তাঁকে জামিন থেকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

তখন ১৯২৮ সাল। ভগৎ সিং 'ছাত্র সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তুললেন। ছাত্র ইউনিয়ন বস্তুতঃ নওজোয়ান ভারত সভারই পরিপূরক সংস্থা। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়—The Lahore Students Union was organised only as an appendage to the Naw Jawan Bharat Sabha or as a recruiting ground for revolutionary work and from the very beginning the secret section of the Union kept working to achieve that object.

(Home (Pol.) Dept., Govt. of India, 1930, File No. 130)

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ ভোরা, চন্দ্রশেখর আজাদ ও শিব বর্মা একত্রে মিলিত হয়ে স্থির করলেন যে, বিধ্বস্ত হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনকে আবার গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দিল্লীর কোট্‌লা ফিরোজ শা'র ধ্বংসস্তূপে সর্বভারতীয় বিপ্লবী বন্ধুদের তাঁরা আহ্বান জানালেন। সেপ্টেম্বরের ৮ ও ৯ তারিখ এই সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট হল।

নির্দিষ্ট দিনে দিল্লীর কোট্‌লা ফিরোজ শা'তে এসে জমা হলেন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। এলেন রাজস্থান থেকে কুন্দনলাল শর্মা, উত্তর প্রদেশ থেকে শিব বর্মা, ব্রহ্মদত্ত মিশ্র, জয়দেব, বিজয়কুমার সিংহ এবং সুরেন্দ্র পাণ্ডে, বিহার থেকে মনমোহন ব্যানার্জী ও মনীন্দ্রনাথ ঘোষ। এ ছাড়া ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ,

মহাবীর সিং, ভগবতীচরণ ভোরা, রাজগুরু, সোহন সিং যশ প্রভৃতি তো ছিলেনই। সম্মেলনের কাজ চলতো রাত্রিকালে। সম্মেলনে স্থির হল যে, বিপ্লব-আন্দোলনের কাজকে সুপরিচালিত করবার জন্য হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনকে পুনর্গঠিত করা হবে। অ্যাসোসিয়েশনের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে, যার কাজ হবে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে ঐক্য-বিধান করা। আহ্বায়ক হলেন বি. কে. সিংহ ও ভগৎ সিং।

ভগৎ সিং ইতিমধ্যেই রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহী হয়েছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই রাশিয়ার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তখন যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমানি, ভগৎ সিং, বিজয়কুমার সিংহ প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র-বাদের আদর্শে তাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা চিন্তা করলেন এবং হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের নাম সামান্য বদল করে 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' রাখলেন। বিজয়কুমার সিংহ তাঁর 'দি নিউ ম্যান ইন সোভিয়েট ইউনিয়ন' গ্রন্থে লিখেছেন— "রাশিয়ায় শ্রমিক ও মজুরের জয়যাত্রা সূচিত হতে দেখে আমরা এক নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।···সমাজতন্ত্রবাদে আমাদের গভীর বিশ্বাস আছে এ কথা বোঝাবার জন্যেই আমাদের দলের নাম বদল করে রাখা হল হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন।"

এলাহাবাদের অজয় ঘোষ তাঁর 'ভগৎ সিং অ্যাণ্ড হিজ কমরেডস' গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন- -"স্বাধীনতার লড়াই কি ভাবে লড়তে হবে এবং সমাজতন্ত্রবাদের রূপ কি হবে—এই ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা। অবশ্য আমাদের মুখ্য কাজ ছিল সশস্ত্র আন্দোলন।" 'অ্যাসোসিয়েশনের' আর একটি উপশাখা এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়— 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। দলের সর্বাধিনায়ক হলেন চন্দ্রশেখর আজাদ।

দলের মধ্যে আজাদের মত স্থিরবুদ্ধি অথচ নির্ভীক বিপ্লবী আর কেউ নন। রিপাবলিকান আর্মির সেনাধ্যক্ষ হওয়ার যোগ্যতা তাঁর চেয়ে বেশী আর কারও ছিল না। আদর্শ সৈনিকের মত তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত; সতর্ক অথচ সক্রিয়। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা।

মধ্যভারতের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে চন্দ্রশেখর কাশীতে

সংস্কৃত পড়তে এসেছিলেন। চোদ্দ বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। হাজতে তাঁর কিশোর-করে দেওয়ার মত হাতকড়া পাওয়া গেল না। বিচারে বেত্রাঘাতের হুকুম হল। তাঁর উন্মুক্ত দেহ বারোবার চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল। সেই কিশোর চন্দ্রশেখর সেদিন শরীরের রক্ত হাতে নিয়ে শপথ করেছিলো, ইংরেজকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। হাজত থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি পুরোপুরি বিপ্লববাদী হয়ে।

অত্যন্ত নীতিবান অথচ সন্ত্রাসবাদী চন্দ্রশেখর উত্তর ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ভিত্তিভূমিকে নিজের হাতের ওপরে তুলে ধরেছিলেন। কাকোরি মামলায় তিনিই একমাত্র আসামী যাকে পুলিস ধরতে পারেনি। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাতেও তিনি অন্যতম আসামী, কিন্তু পুলিসের হাতে ধরা পড়েননি। পুলিসের হাতে ধরা দেওয়ার চিন্তাও তাঁর কাছে ঘৃণা-জনক ছিল।

দলের মধ্যে তাঁর নাম ছিল 'কুইক সিলভার।' পণ্ডিতজী বলেও ডাকা হত তাঁকে। ১৯২৪ সালে বামরৌলি এবং ১৯২৫ সালে কাকোরি ডাকাতিতে নেতা ছিলেন আজাদ। লাহোরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনাও তাঁর। দলের তরুণ সভ্যদের তিনি অস্ত্রশিক্ষা দিতেন ও পিস্তল ব্যবহার শেখাতেন।

আজাদের ব্যক্তিগত চরিত্র যেমন নিষ্কলংক এবং পরিচ্ছন্নতায় ঋজু, দলের নেতা হিসেবেও তিনি তেমনি সুদৃঢ় ও নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিসের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে পিস্তলের গুলিতে মৃত্যুবরণ তাঁর কাছে অনেক বেশী কামনার ছিল।

১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি সহকর্মী যশপাল ও সুরেন পাণ্ডের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। আলোচনার স্থান ছিল এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্ক। যশপাল ও পাণ্ডে চলে গেলে আসেন সুখদেব রাজ। ইতিমধ্যে বীরভদ্র তেওয়ারি নামের এক পুরনো কর্মীও আজাদকে দেখে যান। কিছুক্ষণ পরেই আজাদ দেখলেন, সশস্ত্র পুলিস তাঁকে ঘিরে ফেলেছে।

দুইহাতে রিভলবার ধরে আজাদ গুলিবর্ষণ শুরু করলেন। পুলিসের দলও চারদিক থেকে তাঁর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করতে লাগলো। আহত চন্দ্রশেখর আজাদ সেই পার্কের জমিতেই শেষ শয্যা গ্রহণ করলেন। বীরের মতই মৃত্যুবরণ করেছিলেন আজাদ, পুলিসের হাতে ধরা দেন নি।

দিল্লীর সম্মেলনে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন ও হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির কার্যসূচীও স্থির করা হয়। কার্যসূচীতে রইল—

(১) সাইমন কমিশন বর্জন এবং কমিশন যে ট্রেনে আসছে সেই ট্রেনের ওপর বোমা ফেলা।

(২) কলকাতা, সাহারানপুর, আগ্রা ও লাহোরে বোমা তৈরীর জন্য কারখানা স্থাপন করা।

(৩) কাকোরি মামলায় যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বা সরকারী পক্ষকে সংবাদ সরবরাহ করেছে তাদের হত্যা করা।

(৪) দলের কাজে অর্থসংগ্রহের জন্য সরকারী অফিস, ট্রেজারি ইত্যাদি লুট করা।

আগ্রাতে দলের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হল।

সম্মেলন শেষ হলে ভগৎ সিং তাঁর বন্ধুদের সংগে পাঞ্জাব রওনা হলেন।

বিপ্লবীদের এই সম্মেলনের সংবাদ পুলিসের কাণেও পোঁছেছিল। তারা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছিল। দিল্লী স্টেশনেও প্রচুর পুলিসেব সমাবেশ ঘটে। চন্দ্রশেখর আজাদকে তারা দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আজাদকে ধরা পুলিসের সাধ্যের বাইরে ছিল। ভগৎ সিং জানতেন যে, পুলিস তাঁকেও খুঁজছে। তাই তিনি যথেষ্ট সতর্ক হয়েছিলেন।

শোনা যায়, দিল্লী স্টেশনে তিনি এক পাঞ্জাবী পুলিস কনস্টেবলের বেশ ধরে আসেন। তিনি একটি ট্রেনের কামরায় এসে বসেছেন এমন সময় দিল্লী পুলিসের এক সাব-ইনস্পেক্টার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। সাব-ইনস্পেক্টারটি জিজ্ঞেস করলো—কোথায় যাচ্ছো ?

ভগৎ সিং —ফিরোজপুর

সাব-ইনস্পেক্টার—থানা ?

ভগৎ সিং —নিহাল সিং ওয়ালা

—বেল্ট নম্বর ?

—২৩৪০৫০

—রেলওয়ে পাস ?

—আমার সংগের লোক ওটা বদল করতে গেছে ?

—তার নাম কি ?

—কর্তার সিং।

পুলিস সাব-ইনসপেক্টারটির সন্দেহ গেল না। অথচ হঠাৎ কিছু বলতেও পারে না সে। তাই বুকিং অফিসে কর্তার সিংকে খুঁজতে গেল। ইতিমধ্যে ভগৎ সিং আর একটি কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে পলকে বেশ পরিবর্তন করে ফেললেন। এবারে তিনি এক সাধু, হাতে গীতা। ট্রেন ছেড়ে দিল। কিন্তু পরের স্টেশনেই সেই পুলিস সাব-ইনসপেক্টারটিকে দেখা গেল। সংগে কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে সে গোটা ট্রেনটা খুঁজলো। তবু কর্তার সিং নামের পাঞ্জাবী কনস্টেবলটিকে বা ভগৎকে আর খুঁজে পেলো না। অগত্যা হতাশ হয়ে সে ফিরে গেল। ভগৎ সিং নিরাপদে লাহোরের পথে ভাটিন্ডাতে পেঁৗছোলেন।

ভগৎ সিং'এর চরিত্রে ছিল দুর্জয় জেদ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপরিসীম নিষ্ঠা। তাব হৃদয়ের আবেগপ্রবণতার সংগে মিশেছিল ইচ্ছার দৃঢ়তা। অথচ কোমল ও মধুর স্বভাবের জন্য সহকর্মীদের কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন। করণীয় কাজ সমাধা করতে না পারলে অথবা কেউ হঠাৎ দ্বিধান্বিত হলে ভগৎ সিং প্রচণ্ড রেগে যেতেন। অন্যায়েব জন্য চাবুক মারতে তাঁর দ্বিধা ছিল না, পলকে ক্ষমা করতেও তার ক্লান্তি নেই।

চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎ সিংকে পাশাপাশি তুলনা করে দেখিয়েছেন অজয় ঘোষ। তিনি লিখেছেন, "—আজাদ ছিলেন স্থির এবং সংযত; কখনও চঞ্চল হন না, কোন সময়েই তাঁর সংশয় নেই। তাঁর ছিল লোহার মত শক্ত নার্ভ। কিন্তু ভগৎ সিং'এর মত আবেগপ্রবণতা ছিল না আজাদের; সেই বিবাট কল্পনাশক্তি ছিল না, তাঁব মানসিক সূক্ষ্মতাও না।"

পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব খুব স্বাভাবিকভাবেই ভগৎ সিং'এর ওপর এসে পড়েছিল। তিনি প্রথম থেকেই তাঁর পরবর্তী জীবনের কৃত্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; তাই দেখা যায় যতটুকু সময় পেয়েছেন তিনি আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস ও বিপ্লবের দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। নওজোয়ান ভারত সভা ও হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে তিনি এক অখণ্ড ও সম্পূর্ণ স্বাধীন, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিপ্লব মানে যে শুধু বিদেশী শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ নয়, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক এক আমূল পরিবর্তন তার ইংগিত ভগৎ সিং বারবার দিয়েছেন। লালা রামশরণ দাসের 'দি ড্রিমল্যান্ড'[৩৪] গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যা লিখেছিলেন তা এখানে স্মরণযোগ্য। ভগৎ সিং লিখেছিলেন—

"বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যাঁরা সক্রিয় হয়ে আছেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য—বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ। তাঁদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ ও গৌরবাত্মক কিন্তু একমাত্র এই উদ্দেশ্যই বিপ্লব সাধনার উদ্দেশ্য হতে পারে না। বিপ্লব শুধুমাত্র সামরিক অভ্যুত্থান বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়। বিপ্লবের কর্মসূচীতে রাখতে হবে সমাজকে আধুনিক দর্শন-সম্মত পথে নতুন করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ; বর্তমান যে অবস্থার মধ্যে মানুষ রয়েছে, তার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টির আয়োজন। নতুন সৃষ্টির পথ ধ্বংসের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়।"

তাঁর নিজের ভাষায়—"Destruction is not only essential but indispensable for construction. The revolutionaries have to adopt it as a necessary item of their programme."

॥ এগার ॥

১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যান। ১৯২৬-২৭ সাল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে নানাভাবে এক নিষ্ক্রিয়তার যুগ। গান্ধীজী সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে চরকা ও তকলিতে ডুবে গেলেন। অ্যাসেমব্লিতে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বকে মহারাষ্ট্র গ্রুপ—জয়াকর ও কেলকার—অস্বীকার করে বসলো। সমস্ত দেশে হিন্দু মুসলমান—দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের বীজ ঢুকিয়ে দিল গভর্নমেণ্ট। বস্তুতঃ কলকাতায় ১৯২৬ সালে এক ভয়াবহ দাংগার সৃষ্টি হল। কংগ্রেসকে সেই মুহূর্তে নেতৃত্ব দিয়ে সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কোন লোক ছিল না। মুসলিম লীগও সেই সময়েই মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ পেলো। কংগ্রেসের এই অবসাদগ্রস্ত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে বর্ণনা করলো টাইমস অব ইণ্ডিয়া—"Completeness of the Congress collapse…"

একমাত্র আশার আলো দেখা দিয়েছিল যুব-সম্প্রদায়ের জাগরণে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ঘুণ ধরা নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা নানাভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই নতুন যুব আন্দোলনেরই একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছিল 'নওজোয়ান ভারত সভার'

মধ্যে। ঠিক এই মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে আলোর বর্তিকা বহন করে আনলো 'সাইমন কমিশন'। অর্থাৎ এই কমিশনকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভারতে জাতীয় আন্দোলন আবার সংহত হয়ে নতুন পথে চলবার চেষ্টা করলো।

১৯২৭ সালে নতুন ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড আরউইন। তার নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরী কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে ক্ষমতায় আসীন ছিলেন রক্ষণশীল দল। ১৯২৯ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্ধারিত হওয়ায় তাঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যে, এবারে হয়তো ক্ষমতা চলে যাবে শ্রমিক দলের হাতে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁরা স্থির করলেন যে, নির্বাচনের আগেই ভারতবর্ষের কিছু সংস্কার তাঁরা করে যাবেন। যার ফলে শ্রমিক দলের কাছে রক্ষণশীলদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

১৯১৯ সালের মণ্টেগু সংস্কারের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন-মূলক ব্যবস্থার কিছু অধিকার দেওয়া যায় কিনা, দেখবার জন্যেই পার্লামেণ্ট থেকে এই কমিশন বসানো হলো। কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হলেন—

সার জন সাইমন (চেয়ারম্যান)
ভাইকাউণ্ট বার্নহ্যাম
লর্ড স্ট্রাথ কোনা
এডওয়ার্ড ক্যাডোগান
স্টিফেন ওয়ালস
মেজর অ্যাটলি ও
লেন ফক্স।

স্ট্যাটিউটরী কমিশনের (বা সাইমন কমিশন) সদস্যদের নাম ঘোষণা করার সংগে সংগে সমগ্র জাতির চিত্তে প্রচণ্ড বিরক্তি ও ক্রোধ দেখা দিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিযুক্ত কয়েকজন ইংরেজ সদস্য সমন্বিত কমিশনকে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের পথে সালিশী করতে দিতে কেউই রাজী নয়। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যেমন কমিশন গঠনের পদ্ধতির নিন্দা করলেন, তেমনি মুসলিম লীগও সাইমন কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মহম্মদ আলি জিন্না (তখনও তিনি জাতীয়তাবাদী) মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে

বললেন—"Jallianwalla Bagh was physical butchery, the Simon Commission is the butchery of our soul."

কমিশনের সাতজন সদস্য ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে এসে পৌঁছোলেন। তাঁদের পৌঁছোনোর দিনটিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং এই বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস। কিন্তু বিক্ষোভ দেখানো ছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারেনি। কংগ্রেসের প্রধান পুরুষ গান্ধী তখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন। কারণ, তিনি আলো দেখতে পাননি।

লর্ড আরউইন এবং চেয়ারম্যান সাইমন নানাভাবে কমিশনকে নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিশন যেখানেই গেল সেখানেই শুধু বিক্ষোভ ও বিরোধিতা। ১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে কমিশন লাহোরে পেঁছোলো।

গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে প্রত্যেকটি শহরেই কঠোর পুলিসী ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। লাহোরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবু একটি বিরাট মিছিল লাহোর স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। নওজোয়ান ভারত সভার সদস্যদের চেষ্টায় সংগঠিত এই মিছিলটি বিক্ষোভমূলক ধ্বনি দিতে দিতে এবং কালো পতাকা তুলে "গো ব্যাক সাইমন" রব তুলে স্টেশন ঘিরে ফেললো। 'নওজোয়ান ভাবত সভার' অন্যান্য সভ্যদের সংগে ভগং সিং ছিলেন নেতৃত্বে। তারা গান গাইতে গাইতে গাইতে এগোচ্ছিলো—

"হিন্দুস্থান হামারা হ্যায়, হিন্দুস্থানী হ্যায় হাম,
ঘর যাও সাইমন, জাঁহাকে হ্যায় তুমহারা।"

অর্থাৎ—আমরা ভাবতবাসী, এ' ভারত আমাদের দেশ। সাইমন, তুমি তোমার নিজের দেশে ফিরে যাও।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন বর্ষীয়ান নেতা লালা লাজপত রায়। পুলিস অনেক চেষ্টা করেও এই মিছিল ভাঙতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত তারা লাঠি চালাতে শুরু করলো। কিন্তু পুলিসের লাঠির মুখে দলে দলে লোক জমা হতে লাগলো। নওজোয়ান ভারত সভার সদস্যরা লালাজীকে ঘিরে রইলো পাছে তাঁর দেহে আঘাত লাগে। অবস্থা দেখে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কট ও তার সহকারী স্যাণ্ডার্স ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। স্কট পুলিসকে নির্দেশ দিলো লালাজীকে ঘিরে থাকা দলটির ওপর লাঠি চালানোর। সহকারী স্যাণ্ডার্স নিজে তার ব্যাটন নিয়ে লালাজীর

বুকের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করলো। চারদিকে রক্তস্রোত বইতে আরম্ভ করলো।

আহত লালাজী সেই রক্তস্রোত থামাতে মিছিলকে ছত্রভঙ্গ হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি জনতাকে উদ্দেশ্য করে ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জনে বললেন—"যে সরকার তার নিরীহ প্রজার ওপর নির্বিচারে আঘাত করে, সে সরকার কখনো সভ্য মানুষের সরকার নয়।···I declare that the blows struck at me will be the last nails in the coffin of the British rule in India."

এই লাঠির আঘাতের ফলেই লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু ঘটলো। ১৭ই নভেম্বর তারিখে এই মহৎ জীবনের অবসান।

লালা লাজপত রায়ঃ

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে লালা লাজপত রায় যদিও মধ্যপন্থী বলে পরিচিত, তবুও তাঁর হৃদয় সব সময়েই বিপ্লববাদী চরমপন্থীদের সঙ্গে ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁকে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে বর্ণনা করেছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯২০) তিনিই ছিলেন সভাপতি। প্রথম জীবনে আইনজীবী হিসেবে তাঁর প্রভূত প্রতিপত্তি ও উপার্জন থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশবন্ধু দাশ ও মোতিলাল নেহরুর মতই তাঁর পেশা ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাঞ্জাবে তাঁর জনপ্রিয়তা কল্পনাতীত ছিল। সুভাষচন্দ্রের ভাষায় তিনি ছিলেন "the uncrowned king of that province" সাইমন কমিশন এদেশে এসে পৌঁছলে স্যর জন সাইমন ভারতীয় আইন সভার সহযোগিতা প্রার্থনা করে একটি বিবৃতি দেন। কিন্তু আইন সভার অন্যতম সদস্য হিসেবে লালা লাজপত রায় একটি প্রস্তাব পেশ করে কমিশনকে স্বীকৃতি দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত হয়।

বলা বাহুল্য লালা লাজপত রায়কে গভর্নমেণ্ট মোটেই সুনজরে দেখতেন না। কাজেই কমিশন বয়কটের মিছিলে পুলিস-সুপার স্কট ও অ্যাসিট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্যাণ্ডার্সের আক্রমণ এবং লালা লাজপত রায়কে প্রহারের পেছনে সরকারী অনুমোদন যে ছিল, এ'কথা অনুমান করতে বাধা নেই। এই প্রহারের ফলেই বৃদ্ধ জননেতার মৃত্যু ঘটলো। এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সমস্ত দেশে।

পাঞ্জাবের মানুষ তো কল্পনাই করতে পারেনি যে, এভাবে লালাজীকে

মৃত্যুবরণ করতে হবে। লালাজীর চিতার আগুনের পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নওজোয়ান ভারত সভার সভ্যবৃন্দ। তাদের চোখে অশ্রু, বুকে বেদনার পাহাড়। কিন্তু মনে সঞ্চিত এক অবর্ণনীয় ক্রোধ।

লালা লাজপত রায়ের হত্যাকে সহ্য করা হবে না। মৃত্যুর বদলা চাই মৃত্যু দিয়ে।

তারা শপথ গ্রহণ করলো সেই চিতার সামনে।

১৯২৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে লাহোরের মোজাং বিল্ডিংয়ে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মির গুপ্ত বৈঠক বসলো। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, মহাবীর সিং, জয়গোপাল, কিশোরী লাল, দুর্গা দেবী। এই সভায় দলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ভগৎ সিং বললেন—[১৫]

"সমস্ত দেশে আজ উত্তেজনা। বাংলা তার কাজ সুষ্ঠুভাবেই সমাধা করে চলেছে। তাদের হাতে কিছু অফিসারের প্রাণ গিয়েছে। এদেশের ইংরেজরা ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পরিবার-পরিজনকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এবার তাদের বুঝতে পারার সময় আসছে যে, ভারত আর তাদের হাতে থাকবে না। লালাজীর মহামরণ আজ সমস্ত মানুষের মন কাঁপিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও ভাবতে শুরু করেছে। জওহরলাল নেহরু আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে এ বিষয়ে কিছু প্রস্তাব আনবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন বলে মনে হয়। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ, কংগ্রেস কিছুই করবে না।"

আজাদ বললেন—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে আমরা স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেমেছি। শত্রুর সৈন্যবাহিনী যেমন অগণিত, তাদের হাতে যুদ্ধাস্ত্রও তেমনি অসংখ্য। কিন্তু আমাদের বল, আমাদের আত্মদানের সংকল্প।"

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের যে নায়ক, সেই স্কট ও তার সহকারী স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করা হবে।

ভাবী (দুর্গা দেবী) তখন আহ্বান জানালেন—কে ভার নেবে এই সুমহান এবং কঠিন দায়িত্বের ? এগিয়ে এলেন ভগৎ সিং। বললেন—আমি

আজাদের প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত স্থির হল, ভগৎ সিং একা নয়, তার সংগে থাকবেন রাজগুরু। পুরো নাম শিবরাম হরি রাজগুরু। জন্ম ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনায়। একসময় বারানসীর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ড্রিল-মাস্টার ছিলেন। শ্যামবর্ণ অত্যন্ত সাধারণ চেহারা, কিন্তু যেমন দৃঢ় তাঁর মন তেমনই অব্যর্থ রিভলভারের টিপ। দলের মধ্যে নাম ছিল কখনো

'এম', কখনো 'রঘুনাথ'। ঠিক হল, জয়গোপাল ও শুকদেব স্কট ও স্যাণ্ডার্সের এবং পুলিস অফিসারদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবেন; এবং সবার আড়ালে থেকে তত্ত্বাবধান করবেন আজাদ নিজে।

দিন স্থির হল ১৭ই ডিসেম্বর।

॥ বার ॥

লাহোরের প্রধান রাজপথে যেখানে পাঞ্জাব সিভিল সেক্রেটারিয়েট তারই কাছাকাছি বিপরীত দিকে ছিল 'দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়'। নির্দিষ্ট সময়ে মহাবিদ্যালয়ের প্রধান দরজার সামনের রাজপথে এসে দাঁড়ালেন রাজগুরু এবং ভগৎ সিং। দুজনেই সেক্রেটারিয়েটে স্কটের সদর দপ্তর যেখানে তারই কাছাকাছি পৃথক হয়ে দাঁড়ালেন। আর গেটের মুখে রইলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। আজাদের নির্দেশ ছিল স্কটকে সনাক্ত করবেন জয়গোপাল এবং গুলি করবেন রাজগুরু।

দপ্তর থেকে মোটর সাইকেলে স্কটের বদলে বেরিয়ে এল স্যাণ্ডার্স, পুরো নাম Johan Poyntaz Saunders. জয়গোপাল ইঙ্গিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজগুরুর রিভলভার গর্জে উঠলো। রাজগুরুর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। তাঁর হাতের গুলি স্যাণ্ডার্সের কণ্ঠ ভেদ করায় সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ভগৎ সিং পরপর চারটি গুলি চালালেন স্যাণ্ডার্সের দেহে।

থানার সামনে প্রহরারত কনস্টেবল কয়েকজন গুলির শব্দে চিৎকার করে উঠলো। পুলিস-ইনসপেক্টার ফার্ন সেই চিৎকার শুনে দুজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে ছুটে এল রাজগুরুকে ধরতে। গুলি চালাতে গিয়ে রাজগুরু দেখলেন, তাঁর রিভলভার চলছে না। পলকে তিনি ফার্নকে এমন ধাক্কা দিলেন যে ফার্ন লুটিয়ে পড়লো রাস্তায়। রাজগুরু তখন দৌড়োলেন বিদ্যালয়ের দিকে।

এদিকে ফার্ন উঠে দাঁড়াতেই ভগৎ সিং'এর রিভলভার গর্জন করে উঠলো। ফার্ন আবার ধরাশায়ী হল। ভগৎ সিং ফার্নকে গুলি করার জন্যে এগোচ্ছিলেন কিন্তু আজাদের নির্দেশ শুনতে পেয়ে তিনি রাজগুরুর অনুসরণ করলেন।[৩৬]

ফার্নের পেছনে ছিল কনস্টেবল চন্নন সিং। চন্নন সিং'এর দুর্বুদ্ধি হলো, সে ভগৎ সিংকে ধরতে ছুটলো। কিন্তু সে জানতো না, পাশে

ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। আজাদের গুলিতে চন্নন সিং লুটিয়ে পড়লো। একঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতালেই চন্নন সিং মারা যায়।

রাজগুরু ও ভগৎ সিং মহাবিদ্যালয়ের হস্টেলে এসে ঢুকলেন এবং অন্য পথে বেরিয়ে মোজাং বিল্ডিংয়ের গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে পৌঁছোলেন।

কলেজ হস্টেল থেকে বেরোবার আগেই দু'জনেই বেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। ভগৎ সিং কয়েক মিনিটের মধ্যেই কামিয়ে নিলেন এবং তাঁর দাড়ি ও গোঁফ বর্জন করলেন পুরোপুরি। সম্ভবতঃ হস্টেল থেকে তিনি এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কামিয়েছিলেন। বন্ধুটির স্যুটও তিনি পরে নিলেন। এবং বন্ধুটির কাছ থেকেই কিছু টাকা ধার নিলেন।[৩৭]

এরপর দাড়ি গোঁফ কামানো স্যুট পরিহিত ভগৎ সিং এসে হাজির হলেন তাঁর বন্ধু ভগবতীচরণ ভোরার বাড়ি। ভোরা ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী দুর্গা দেবী ভগৎ সিংকে প্রথমে চিনতেই পারেন নি। কিন্তু ভগৎ পরিচয় দিয়ে বললে—ভাবীজী, স্কটকে খুন করেছি।[৩৮] সারা শহর এখন পুলিস তছনছ করছে। আজই পালাতে হবে। তুমি সাহায্য করো।

দুর্গা দেবী আর ভগৎ'এর মধ্যে পরামর্শ হল। পুলিসের হাত এড়িয়ে লাহোরের বাইরে যাওয়া এখন দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যেতেই হবে। উপায় নির্ধারণ করলেন দুর্গা দেবী।

ইউরোপীয় পোশাকে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্র এবং ভৃত্যকে নিয়ে স্টেশনে এলেন এবং লক্ষ্ণৌর টিকিট কেটে ফার্স্ট ক্লাসে উঠে বসলেন। তাঁদের চারদিকে পুলিসেব ব্যূহ। কিন্তু কেউই সন্দেহ করতে পারলো না যে ওই ভদ্রলোক ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গিনী হলেন দুর্গা দেবী। দুর্গা দেবী তাঁর শিশুপুত্র শচীনকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ভৃত্যটি আর কেউ নয়, রাজগুরু নিজে।[৩৯]

লক্ষ্ণৌ থেকে ভগৎ ও দুর্গা দেবী কলকাতার ট্রেনে উঠলেন।

লাহোরের রাজপথে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও আজাদ প্রমুখ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু তার অল্প সময়ের মধ্যে পুলিস বাহিনী বেরিয়ে এল সদর দপ্তর থেকে, আর দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের হস্টেল ও মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষ খুঁজে খুঁজে তছনছ করে ফেললো। ছড়িয়ে গেল প্রত্যেকটি রাস্তায় পুলিস। স্টেশনগুলি পুলিসে ছেয়ে গেল। হত্যাকারীকে যেমন করেই হোক ধরা চাই।

পরের দিন লাল কাগজে ছাপা ইস্তাহারে শহর ছেয়ে গেল। দেয়ালে

দেয়ালে পোস্টার পড়লো—Saunders is dead, Lalaji is avenged.

"স্যান্ডর্স মারা গয়া ঔর লালাজীকে অপমান কা বদলা লে লিয়া গিয়া।"

ইস্তাহারে বলা হয়েছে—

Beware Bureaucracy

The killing of J. P. Saunders was only to avenge the murder of Lala Lajpat Rai.

একটি প্রচার পত্রে লেখা হল—

"সাধারণ এক পুলিস অফিসারের হাতে আমাদের সর্বজনমান্য নেতার হত্যা সমগ্র জাতির ললাটে অপমানের কালিমা লেপন করেছিল। ভারতের যুবসমাজের কাছে এই কালিমা মোচনের কাজ তাই মহান কর্তব্যরূপে গণিত হয়েছিল। আজ পৃথিবী জানুক যে, দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতবাসী সর্বদা সজাগ এবং দেশের মানরক্ষার জন্য তারা সকল প্রকার কৃচ্ছ্রতাসাধনে প্রস্তুত। একটি মানুষকে মারতে হল বলে আমরা দুঃখিত; কিন্তু আমরা হত্যা করেছি এমন একটি লোককে যে এই অমানবিক ও অন্যায় শাসন যন্ত্রের অংশবিশেষ। তার মৃত্যুর অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি দালালের মৃত্যু। রক্তপাত করতে হল বলে আমরা ক্ষুব্ধ, কিন্তু বিপ্লবের বেদীমূলে রক্তপাত অপরিহার্য। আমাদের উদ্দেশ্য সেই বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া যা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাবে।"

॥ তের ॥

পরবর্তীকালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী হংসরাজ ভোরার বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, এই পোস্টার ও ইস্তাহারগুলির রচয়িতা ছিলেন ভগৎ সিং নিজে। ইস্তাহারের নিচে স্বাক্ষর রয়েছে জনৈক 'বলরাজ'-এর। এই বলরাজ আসলে ভগৎ সিং নিজেই।

ভগৎ সিং'এর অন্যতম সহকর্মী এবং 'এইচ. এস. আর. এ.'র সভ্য শিব বর্মার বিবৃতি থেকে জানা যায়, দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যাঁদের তাঁদের মধ্যে বিজয়কুমার সিংহ, শিব বর্মা, ক্ষুদিরাম (পরিচয় পাওয়া যায়নি) ও দাদার (ফণী ঘোষ) নামও উল্লেখযোগ্য।

জয়গোপাল অ্যাপ্রুভার হয়ে যে বিবৃতি দেয়, তার ফলেই দলের প্রত্যেকটি লোককে জানা পুলিসের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।[৪০]

এদিকে ভগৎ সিং দুর্গা দেবী ও তাঁর শিশুপুত্র শচীন'এর সংগে কলকাতায় এসে পৌঁছোলেন। এখানেও তাঁরা পুলিসের দৃষ্টিকে সহজেই ফাঁকি দিয়ে সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে সুশীলা-দিদির ঘরে এসে উঠলেন। সুশীলা-দিদি ছিলেন শেঠ সাজুরামের গৃহে শিক্ষিকা। তাঁর কাছে তখন ভাই ভগবতীচরণ ভোরাও ছিলেন। দুর্গা দেবী ও শচীনকে ভগবতীচরণের হাতে তুলে দিয়ে ভগৎ নিশ্চিন্ত হলেন।

কলকাতায় তাঁর একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী ইতিমধ্যেই তৈরী করে নিয়েছিলেন ভগৎ। তাঁর বন্ধু ও উপদেষ্টা ভগবতীচরণের সংগে আলোচনা করলেন এ বিষয়ে। তারপর দেখা করলেন অনুশীলনী দলের নেতাদের সংগে। ভগৎ দেখা করলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবীন্দ্রমোহন সেন ও প্রতুল গাংগুলীর সংগে।[৪১] তিনি দলের নেতাদের কাছে তাঁর নিজস্ব কর্মসূচী পেশ করলেন কিন্তু কোন উৎসাহ বা সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেলেন না। কারণ নেতারা তখন দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁরা নিজস্ব কোন পরিকল্পনা গড়ে তুলতে পারেন নি। তাঁদের এই নীরব এবং কংগ্রেসের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মনোভাবের জন্যই দলের মধ্যে রিভোলটিং গ্রুপ মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছে।

বাংলার বিপ্লবী নেতাদের ওপর ভগৎ সিংয়ের প্রবল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁদের অনেকেই তখন কংগ্রেসের মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছেন। অন্যরাও কোন সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। নেতৃত্বের এই ব্যর্থতায় তরুণ কর্মীরা কিছুটা হতাশ। তাদের মধ্যে একটি দল গোপনে বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজ করে চলেছেন। এই দলটির নামই রিভোলটিং গ্রুপ। এ'দের মধ্যে ছিলেন সূর্য সেন বা মাস্টারদা'র দল, সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন সেন, বিনয় রায় ও যতীন দাস। ভগৎ সিং আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে, তাঁর পরিকল্পনায় যতীন দাস'এর সহায়তা চাইই।

যতীন দাসের সংগে ভগৎ'এর আলাপ করিয়ে দিতে দলের পক্ষ থেকে এসেছিলেন ফণী ঘোষ। সংগে বিজয়কুমার সিংহ। এ' ছাড়াও এলাহাবাদের জিতেন সান্যাল ও একটি চিঠি দিয়েছিলেন যতীন দাসের নামে।

যতীন দাস :

১৯০৪ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে কলকাতায় যতীন দাসের জন্ম। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯২১ সালে তিনি ম্যাট্রিক

পাস করলেন। সেই বছরেই গান্ধীজী দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। বড়বাজারে একটি বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে তাঁর ছ'মাস জেল হয়। তিনি যখন বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. পড়ছেন তখনই হঠাৎ বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সংস্পর্শে এলেন। ১৯২৪ সালে শচীন্দ্রনাথ যখন বিপ্লব আন্দোলনের সর্বভারতীয় একটি সংগঠন 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তুললেন, তখন যতীনই হলেন তাঁর অন্যতম সহকারী।

"It was during this time that some very promising young members of the Anushilan Samiti came to know him. Jatin Das was the most remarkable among them."

[Jogeshchandra Chatterjee—In Search of Freedom]

যতীন দাসকে ভগৎ সিং খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, কারণ বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্রের কাছে তিনি বোমা তৈরী করার প্রণালী আয়ত্ত করেছেন।[৪২] হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের যে ক'জন সভ্য তখনও বাইরে, তার মধ্যে যতীন দাসই বোমা তৈরীর কাজে সবচেয়ে অভিজ্ঞ।

যতীন দাস তখন হাজরা রোডে ক্ষীরোদবাবুর বাজারের সামনে একটি মেসে থাকেন। আসলে তাঁর বাড়ি ডোভার রোডে। কিন্তু ছোট ভাই কিরণচন্দ্র বাংলার বাইরে দিল্লীর আনন্দ পর্বতে অন্তর্বীণ। পিতা বঙ্কিম চন্দ্রও গেছেন সেখানেই। তাই যতীন বাড়িটা ভাড়া দিয়ে মেসে উঠে এলেন।

এই মেসে যতীন দাসের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেখানেই রাত্রে থেকে গেলেন ভগৎ সিং।[৪৩]

ভগৎ সিং যতীন দাসকে খুলে বললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। ভগৎ গান্ধীবাদী নন। তাঁর বক্তব্য—

অন্যায় ও উৎপীড়নের জন্য যখন শারীরিক শক্তিকে প্রয়োগ করা যায় তখন তাকে হিংসাত্মক কার্য বলে। নিশ্চয়ই বিপ্লবীরা হিংসাত্মক কার্যকে সমর্থন করে না। অন্যদিকে অহিংসার অর্থ আত্মিক শক্তি; স্বীয় ও জাতীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আত্মত্যাগ ও আত্মনির্যাতনের পথে এই আত্মিক শক্তির প্রয়োগ। বিপ্লবী যখন অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সে দাবি আদায়ের জন্য যুক্তি প্রয়োগ করে, সমস্ত আত্মিক শক্তিকে নিয়োজিত করে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে; এবং সাফল্যের জন্য চরম নির্যাতন

ভোগ করতেও প্রস্তুত হয়। তার সাধনাকে সর্বদিক দিয়ে জোরদার করতে সে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। সত্যাগ্রহর অর্থ যদি হয় সত্যর জন্য সাধনা, তাহ'লে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মিক শক্তির সঙ্গে দৈহিক শক্তিকেই বা কেন প্রয়োগ করা হবে না ?

ভগৎ সিং বললেন—বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং বিপ্লবের অগ্নি-শিখাকে জ্বালিয়ে রাখতে হলে নিরন্তর কর্মোদ্যোগ চাই। সেই কর্ম হবে মূলতঃ নিপীড়কের হাতের মুঠিতে আঘাত করে চলা। বাংলার মানুষ অনেক বেশী সচেতন। তবু এখানে বিপ্লবকে যেভাবে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করা হচ্ছে, পাঞ্জাবে তার চেয়েও বেশী কিছু করা দরকার। পাঞ্জাবের মানুষ এখনও তৈরী হয়নি। তাদের মধ্যে বিপ্লবের কথা পৌঁছে দিতে হলে, প্রেরণা সৃষ্টি করতে হলে নতুন কিছু করতে হবে।

ভগৎ সিং বললেন—"আমি নতুন একটা কিছু করে যেতে চাই। আমার কাজে যেন পাঞ্জাব থেকে সারা ভারতেব মানুষের মনে সাড়া জাগে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

আর্যসমাজেব মন্দিরের ছাদে ভগৎ সিং আবাব মিলিত হলেন কমলনাথ তেওয়ারীর সঙ্গে। এলেন বৈজনাথ এবং যতীন দাস। কমলনাথ সংগ্রহ করে এনেছিলেন নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড। যতীন দাস তৈরী করলেন গানকটন ফিউজ। ভগৎ খুশী হলেন এবং যতীনকে রাজী করালেন আগ্রায় যেতে। আগ্রায় গিয়ে দলের অন্যান্যদের তিনি শিখিয়ে দেবেন বোমা তৈরীর প্রণালী।

কলকাতা ত্যাগ করার আগে ভগৎ গেলেন একটা ট্যাক্সি নিয়ে বরানগরে, নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে।

নিরালম্ব স্বামী অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারে শ্রীঅরবিন্দর সাথী। ১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবে গেলেন বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে। যতীন্দ্রনাথ দেখা করেছিলেন সর্দার অজিত সিং ও সর্দার কিষণ সিং-এর সঙ্গে। তারা দু'জনেই যতীন্দ্রনাথের হাতেই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। সর্দার কিষণ সিংই হলেন ভগৎ সিং-এর পিতা।[৪৪]

"ছত্রপতি শিবাজীর মত বীরত্বব্যঞ্জক তেজোদৃপ্ত চেহারা। দীর্ঘ বলিষ্ঠ বপু, সিংহগ্রীব, বৃষস্কন্ধ, কপাটবক্ষ, লোহার মুগুরের মত পেশী-পুষ্ট দীর্ঘবাহু।······মাথা নুইয়ে মাধবী গেট পেরিয়ে এসে উঠানে

দাঁড়ালেন ···ভগৎ সিং।······কাঁধের হোল্ড-অল আর হাতের স্যুটকেস নামিয়ে রেখে স্বামীজীকে প্রণাম করে বসলেন ভগৎ সিংজী।"[৪৫]

এরপর দিল্লীতে ফিরে এলেন ভগৎ সিং। তাঁকে দেখা গেল সোহন যশ-এর সঙ্গে।[৪৬]

হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির কাজের জন্য বোমা চাই। বোমা তৈরীর মূল ঘাটি হল আগ্রাতে। ভগৎ সিং যতীন দাসকে নিয়ে এলেন আগ্রাতে।

আগ্রার ঘাটিতে যতীন দাসকে পাহারা দেওয়ার জন্যে রইলেন ভগৎ সিং নিজে এবং বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয়কুমার সিংহ, শিব বর্মা ও ললিত মুখার্জী। নির্জনে একটি বাড়ি ভাড়া করে তাঁরা কাজ চালাতে লাগলেন। এখানে কোন কোন দিন মোটেই খাওয়া জুটতো না। সারারাত পিস্তল হাতে নিয়ে পাহারা দিতে হতো। যতীন ভগৎ সিং-এর নির্দেশমত বোমা তৈরী করলেন।

যতীনের কাছে বোমা তৈরীর তালিম নিয়ে শুকদেব লাহোরের কাশ্মীর বিল্ডিং-এ আর একটি ঘাটি তৈরী করলেন, আর শিব বর্মা গেলেন সাহারানপুরে।

॥ চৌদ্দ ॥

ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকাও তখন নতুন পথে বিবর্তিত হতে চলেছে। সাইমন কমিশনকে একদিকে যেমন বয়কট করা হল, অন্যদিকেও তেমনি কমিশনের উদ্দেশ্যকে অর্থহীন করে তোলার জন্যে মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের একটি কনস্টিটিউশনও তৈরী করা হল। এই নতুন কনস্টিটিউশনে (নেহরু কনস্টিটিউশন নামে খ্যাত) স্বাক্ষর দিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ—পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, সার আলি ইমাম, স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু, এম. এস আনে প্রমুখ ব্যক্তিরা। মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র দেশের যুবসমাজকে আহ্বান জানালেন, দেশসেবার জন্য কংগ্রেসের মধ্যেই স্বতন্ত্র যুব সংগঠন গড়ে তোলার জন্য।

লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে নেহরু কমিটির রিপোর্ট নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

কারণ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস-এর পক্ষপাতী তরুণ দল যাঁদের পুরোভাগে ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল—তাঁরা জানালেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁদের লক্ষ্য।

এদিকে কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম লীগ তার চোদ্দ দফা দাবি নিয়ে হাজির হল। মুসলিম লীগের অযৌক্তিক দাবির বহর দেখে হিন্দু মহাসভার নেতারাও বেঁকে বসলেন। এই অবস্থায় সকলেই চেয়ে রইলেন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের দিকে।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রবীণ ও তরুণদলের মধ্যে একটি ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তরুণদল তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ করলেন। আর গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রধান দল রাখলেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। এই অধিবেশনে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত উপস্থিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাদের মধ্যে সতীন সেন, ভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত রায়, যতীন দাস ও সতীশ পাকড়াশির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভোটে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব ৯৭৩—১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হল। গান্ধীজী এরপর গভর্নমেণ্টকে একবছর সময় দিয়ে বললেন যে, একবছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত না হলে তিনি আন্দোলনে নামবেন।

গান্ধীজীর তথা কংগ্রেসকর্মীদের এই বিলম্বিত লয়ের রাজনীতিতে একদিকে তরুণ বিপ্লবীরা যেমন হতাশ হলেন, অন্যদিকে ভাইসরয় লর্ড আরউইন তেমনি সুযোগ পেলেন তাঁর শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলার। বস্তুতঃ গান্ধীজী যেন ব্রিটিশ সরকারেরই অনুকূলে একটি অমূল্য সুযোগ এনে দিলেন।

তাই দেখা গেল ভদ্রলোক (?) লর্ড আরউইন একদিকে গান্ধীজীর সংগে আলোচনায় ব্যাপৃত রইলেন, অন্যদিকে পেছন থেকে দমননীতির ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলতে সচেষ্ট হলেন।

দমননীতিকে সন্ত্রাসমূলক করে তুলবার জন্য ১৯২৯-এর এপ্রিলেই আইন সভায় 'পাবলিক সেফটি বিল'-টি পাস করানোর ব্যবস্থা করা হলো।

একই দিনে এবং একই সংগে তাঁরা ট্রেডস ডিসপিউট বিলটিও পাস করাতে চাইলেন। ১৯২৭ সাল থেকে একদিকে যেমন যুবসমাজে

জাগরণের সর্বাঙ্গীন চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনই শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাও দেখা যাচ্ছিল। খড়্গপুরে রেলওয়ে স্ট্রাইক এবং তারপরেই ১৯২৮ সালে জামশেদপুরে টাটা আইরনে শ্রমিক ধর্মঘট সরকারী মহলকে সচকিত করে তুলেছিল। সম্ভবত গভর্নমেন্ট আরও ত্রস্ত হয়ে পড়লো বোম্বের টেক্সটাইল স্ট্রাইকে, যাতে প্রায় ষাট হাজার শ্রমিক জড়িত ছিল। টেক্সটাইল স্ট্রাইকের অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত কর্মীদের নেতৃত্ব।

কাজেই এই দু'টি বিল পাস করানো গভর্নমেণ্টের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। একটির দ্বারা দেশের শ্রমিক আন্দোলন এবং অপরটির দ্বারা যুব আন্দোলনের প্রসার রুদ্ধ করে দেওয়া যাবে।

এই পরিবেশে ভগৎ সিং চাইলেন এমন কিছু করতে যাতে দেশের মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। তরুণ ভগৎ সিং উদ্বেল হয়ে উঠলেন আবেগে। সুযোগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করতে তিনি রাজী নন। তিনি চাইলেন আপন আত্মদানের মাধ্যমে সারা দেশকে জাগিয়ে দিতে।

দিল্লীতে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের গোপন সভা বসলো। এবং ভগৎ তাঁর পরিকল্পনা পেশ করলেন। ভগৎ বললেন—

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ন্যায়নীতির কোন স্থান নেই। প্রজাদের তারা লুট করতে, শোষণ করতে এবং হত্যা করতে ব্যগ্র। এবং এরই জন্য তারা দমনমূলক আইন পাস করাবে।"

প্রতিরোধের উপায় কি একথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন— "আত্মদান। আত্মদানের মধ্য দিয়ে আইনসভার ব্রিটিশ ও ভারতীয় সভ্যদের চোখ ফোটাতে হবে।"

চন্দ্রশেখর আজাদ বললেন—কি ভাবে?

ভগৎ—"আইন সভায় যখন নিরাপত্তা বিল (Public Safety Bill) নিয়ে আলোচনা হবে, তখন প্রতিবাদ জানানোর জন্যে আইন সভার ভেতরে বোমা ফেলা হবে। সভার সভ্যদের জানাতে হবে যে, এমন একটি আইন পাস করার আগে তাঁরা যেন ভেবে দেখেন। আমাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রচারপত্র ছাপা হবে এবং সকলের হাতে তা তুলে দিতে হবে।"

ভগৎ আরও বললেন যে, "আমাদের বোঝাতে হবে—ভারতের যুব-সমাজ আজ জেগে উঠেছে। বিপ্লব এগিয়ে এসেছে।"

ভগৎ সিং'এর পরিকল্পনা সভায় গৃহীত হল। স্থির হল যে, দর্শকের আসনের পাস যোগাড় করা হবে। বোমা ফেলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোন প্রাণহানি না হয়, বা কোন লোকের আঘাতও না লাগে। যাঁরা এই কাজের ভার নেবেন, তাঁরা সভার মধ্যেই বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘোষণা করবেন। তারপর আত্মসমর্পণ করবেন পুলিসের হাতে।

কাজ শেষ হলে পলায়নের প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিলেন ভগৎ সিং। বললেন—এদের যখন বিচার হবে, তখন দেশের মানুষ জানতে পারবে আমাদের উদ্দেশ্য। আর তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে প্রেরণায়।

কে যাবে—এই প্রশ্নে ভগৎ বললেন—"আমি"। আপত্তি উঠলো আজাদের কাছ থেকে। ভগৎ ইতিপূর্বেই স্যাণ্ডার্স হত্যার ব্যাপারে জড়িত। ধরা পড়ার ফল তাঁর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু ভগৎ সিং অটল। অবশেষে তিনি মত আদায় করলেন সকলের। শুধু স্থির হল তাঁর সঙ্গে আরও একজন কেউ যাবে। কে সেই আর একজন?

বটুকেশ্বর দত্ত এগিয়ে এলেন—আমি যাব।

বর্ধমানের ছেলে বটুকেশ্বর, মানুষ হয়েছেন কানপুরে। কানপুরেই তিনি হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন'এর সভ্য হন এবং ভগৎ সিং'এর সংশ্রবে আসেন। মধ্যে কিছুদিন হাওড়ার এক মেসে ছিলেন। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে হাওড়া থেকে একদল মজুরকে সংগঠিত করে তিনি কংগ্রেস মণ্ডপে নিয়ে আসেন। হাওড়ার মেথর ধর্মঘটের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এইসময় তিনি হিন্দীতে ইস্তাহার লিখে দিতেন এবং শ্রমিকদের সভাতে বক্তৃতাও দিতেন। "...অন্য অনেকের মত বটুকেশ্বর দত্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন নি।"[৪৭] বটুকেশ্বর ভগৎ-এর অনুগত বন্ধু। তাই তাঁর অনুরোধ সকলে মেনে নিলেন।

ইতিমধ্যে আগ্রার গোপন আস্তানায় যতীন দাস বোমা তৈরী করে চলেছেন। বোমার মসলার জন্যে তিনি পিক্রিক এসিড ও পটাসিয়াম ক্লোরেট ব্যবহার করেছিলেন বলে পুলিস রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। সেই বোমা ভগৎ সিং ও ভগবতীচরণের সামনে ঝাঁসির জঙ্গলে পরীক্ষা করা হল।

ইতিমধ্যে শুকদেব লাহোরে এলেন কলকাতা থেকে পাঠানো বোমার খোল সংগ্রহ করতে। লাহোরে তিনি একটি বাড়িভাড়াও করলেন বোমা তৈরীর জন্যে।

।। পনের ।।

কুখ্যাত বিল দুটি আইন সভায় ৮ই এপ্রিল তারিখে পাস করানো হবে বলে ঠিক হয়েছিল। ভগৎ সিংও স্থির করলেন যে, ওই তারিখেই বোমা ফেলা হবে। পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটবে কেউ জানে না। কাজেই দুজনে অর্থাৎ ভগৎ ও বটুকেশ্বর—দিল্লীর কাশ্মীরী গেটে এসে একসঙ্গে তাঁদের ফোটো তোলালেন। এই যুগ্ম ফোটো পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর ডি. প্যাট্রিক-এর রিপোর্টে এ সম্বন্ধে লেখা হয়—

The conspirators, it would appear, had made up their mind that as forced through by the Viceroy in the teeth of popular opposition, it was desirable that some effective protest should be made against these unjustified measures of the Government. Bhagat Singh and B. K. Dutta were accordingly taken to Delhi and kept in the house which had been hired. 4 or 5 bombs prepared in Agra were also brought to Delhi. [File No. 192/29—Home-Pol.]

প্যাট্রিক-এর রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, এই পরিকল্পনা নিয়ে শুকদেবের সঙ্গে ভগৎ সিং'এর মতবৈষম্য ঘটে কারণ শুকদেব এর ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। একসময় শুকদেব ভগৎকে ভীরু বলে বিদ্রূপও করেন। শোনা যায়, ভগৎ'এর বন্ধু হলেও দলের মধ্যে একমাত্র শুকদেবই ভগৎ'এর প্রতি ঈর্ষালু ভাব পোষণ করতেন।

"Sukhdeb was in Delhi not very long before the outrage and he and Bhagat Singh had a sharp difference of opinion in regard to the advisability of the project as planned in course of which Sukhdeb taunted Bhagat Singh with being coward."

আইন সভায় বোমা ফেলতে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে ভগৎ শুকদেবকে তাঁর শেষ চিঠি লেখেন। লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিংয়ে শুকদেবকে গ্রেপ্তার করা হলে, তাঁর কাছ থেকে ভগৎ সিং'এর এই চিঠিটি পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত অভিমান থেকে লেখা এই চিঠিতে ভগৎ'এর মনের অন্তরঙ্গ ছবিটি পাওয়া যায়। ভগৎ লিখেছিলেন ঃ

"যখন তুমি আমার এই চিঠি পাবে, তখন আমি চলে গিয়েছি—কোন এক অনির্দিষ্ট গন্তব্য পথে রওনা হয়েছি। তুমি জেনে রাখো যে, আজ আমি ভীষণ সুখী, এত সুখ আগে কখনও পাইনি। আমার জীবনের সমস্ত মাধুর্য আমার সামনে, অনেক মধুর স্মৃতি এখন চোখের সামনে ভাসছে ; তবু আমি যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। কাল পর্যন্ত একটা চিন্তাই শুধু বুকের কাছে খচখচ করে বিঁধছিল ; যখনই ভাবছিলাম যে আমার নিজের ভাই আমাকে ভুল বুঝেছে এবং দুর্বল বলে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু আজ আমি খুব খুশী। আজ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, এটা নিছক ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। আমি সবকিছুই খুলে বলতে চেয়েছি বলেই, আমাকে অনেকে ভুল বুঝেছে, ভেবেছে এসব আমার বাগাড়ম্বর। আমার সত্যস্বীকারকে সকলে দুর্বলতার প্রকাশ বলে মনে করেছে। কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি যে, যা ভুল বোঝা যায় তা নিছকই ভুল। আমি অনুভব করছি যে, আজ আমি আমাদের মধ্যে কারও তুলনায় দুর্বল নই।

ভাই, আজ পরিষ্কার মন নিয়েই আমি চললাম। কিন্তু তোমার মনও কি পরিষ্কার হয়েছে ? মনে রেখো, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। ধীর স্থির হয়েই তোমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আগেভাগেই সুযোগ খুঁজবার জন্যে অধীর হয়ে উঠো না। মনে রেখো, তোমাকে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, এবং কাজ চালিয়ে যেতে হবে।···

···এবারে যা বলছিলাম, আমার কৈফিয়তকে আবার তুলে না ধরে পারছি না। আবার আমি বলছি যে, আমার মনে এখনও অনেক আশা, আমার জীবনে এখনও অনেক মাধুর্য। কিন্তু প্রয়োজনে আমি সব ত্যাগ করতে পারি এবং আমি মনে করি এটাই হল সত্যকার ত্যাগ। যদি কেউ মানুষ হয়, তবে তার চলার পথে কোন বাধাই বাধা হয়ে থাকে না। এর বাস্তব পরিচয় তুমি এইবারে পাবে। কোন লোকের চরিত্র আলোচনা

করতে গেলে তুমি একটি কথা আগে জেনে নেবে যে, প্রেম তার জীবনের সহায়ক হয়েছে কিনা। আমি এ প্রশ্নের উত্তর আজ দিচ্ছি—হ্যাঁ হয়েছে। প্রথম প্রচেষ্টার নিদারুণ ব্যর্থতা ও পরাজয়ের পর সেই দুর্নিবার বেদনাকে সহ্য করা মাৎসিনির পক্ষে সম্ভব হত না হয়তো। হয়তো এরপর মাৎসিনি (Mazzini) পাগল হয়ে যেতেন কিম্বা আত্মহত্যা করে বসতেন, যদি না তাঁর প্রেমাস্পদা এক নারীর চিঠি তাঁকে নতুন করে প্রেরণা দিত।

ভালোবাসার নৈতিক মান যদি ধরতে চাও তবে, আবেগ ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু নেই। তবে সে আবেগ মানসিক আবেগ, মাধুর্যে পরিপূর্ণ। ভালোবাসার মধ্যে কখনও জান্তব প্রবৃত্তির স্থান নেই। ভালোবাসা মানুষের চরিত্রকে মহৎ করে। সত্যকার প্রেম চেষ্টা করে সৃষ্টি করা যায় না, আপনা থেকেই তা আসে—কখন তা কেউ জানতে পারে না।"[৪৮]

১৯২৯'এর আটুই এপ্রিল সেই উল্লেখযোগ্য দিন। ট্রেড ডিসপিউট বিল ও পাবলিক সেফটি বিল—দুটিই সাধারণ সদস্যদের কাছে গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত। তবু ভাইসরয় বিল দুটি আইনে পরিণত করবার নির্দেশ দেবেন। আইন সভা লোকে পরিপূর্ণ। সদস্যরা ছাড়াও প্রেস রিপোর্টার ও দর্শকদের গ্যালারিতে প্রচণ্ড ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। ভগৎ সিং-এর গায়ে ছিল নীলাভ একটি কোট এবং মাথায় ফেল্ট্ হ্যাট। তাঁদের অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশের পাস দিয়েছিলেন একজন মনোনীত সদস্য। কাজেই প্রহরারত সার্জেন্ট তাঁদের দেহ সার্চ করা দরকার আছে বলে মনে করেনি। তাঁরা দুজনে দর্শকদের গ্যালারিতে আসন গ্রহণ করলেন। প্রথমে ট্রেড ডিসপিউট বিলটি উঠলো। সরকার পক্ষীয় সদস্যরা বিলটিকে সমর্থন জানিয়ে বললেন—এদেশে যুবসমাজের কিছু অংশ রাশিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরকার-বিরোধী কাজে লিপ্ত। কাজেই এমন একটি বিলের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিলটির ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট বিঠল ভাই প্যাটেল উঠে দাঁড়ালেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভগৎ ও বটুকেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হল। বোমা বিস্ফোরণের জন্য ভগৎ স্বরাষ্ট্রসচিবের আসনের পেছনের খালি জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন, যাতে কেউ আঘাত না পায়। তবু

শব্দের প্রচণ্ডতায় ও ধোঁয়ায় যখন সকলে বিভ্রান্ত, তখন দ্বিতীয় বোমাটি ছাড়লেন ভগৎ।

সমস্ত হল ধোঁয়ায় অন্ধকার। চারদিকে চিৎকার ও দৌড়োদৌড়ি। সেই হট্টগোলের মধ্যে দু'টি মানুষ স্থির ও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে। শব্দ ও গোলমাল একটু কমতেই তাঁরা চিৎকার করে শ্লোগান তুললেন—

ইনকিলাব—জিন্দাবাদ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—ধ্বংস হোক।

দু'জনে সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো ইস্তাহার বিলি করতে শুরু করে দিলেন। সেই দিনই বৈকালীন বিশেষ সংখ্যায় হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় সেই প্রচারপত্র ছাপা হল। প্রচারপত্রে লেখা ছিল—

"বধিরকে শোনাবার জন্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকারের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ একটি অবস্থায় এক ফরাসী বিপ্লবী এই কথা বলেছিলেন। আমরাও বলছি। কারণ এর দ্বারা আমাদের কাজে যুক্তিযুক্ততার বিচার হবে।

"গত দশ বছরে শাসন সংস্কারের নামে যে অবমাননাকর প্রহসন ঘটানো হয়েছে, আমরা তার উল্লেখ করতে যাচ্ছি না, এমনকি এই আইন সভার মাধ্যমে সমগ্র জাতির কপালে যে লাঞ্ছনার কালিমা মাখানো হয়েছে, আমরা তারও পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না, আমবা প্রতিবাদ জানাচ্ছি কারণ যখন জাতি আইনসভা থেকে কিছু সংস্কাব আশা করছে তখন এই আইনসভাতেই দমনমূলক পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেড ডিসপিউট বিল ভারতবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

"আপনাদের কাছে আমাদেব নিবেদন এই যে, যাঁরা এই আইনসভায় জনপ্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় ফিরে যান, এবং সাধারণ মানুষকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করুন। সরকারও জানুক যে, আমরা শুধু পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেড ডিসপিউটস বিলের প্রতিবাদই করছি না, লালা লাজপত রায়ের বর্বর হত্যায় প্রতিবাদও জানাচ্ছি। এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসের কাছ থেকে আমরা যা পাই সেই শিক্ষাকেও সোচ্চারে ঘোষণা করে বলছি যে, মানুষের পর মানুষকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তবুও মুছে দেওয়া যায় না তার চিন্তাকে। বড় বড় সাম্রাজ্য ধসে পড়েছে, কিন্তু আইডিয়া মরে নি।

"আমরা গভীর ভাবে দুঃখিত যে, যদিও মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র মনে করি, আমরা, যারা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, মানুষ

পরিপূর্ণ শান্তি এবং স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস করবে বলে ভাবি, সেই আমরা মানুষের রক্তপাত ঘটাতে বাধ্য হয়েছি। আমরা জানি যে, বিপ্লবের বেদীমূলে ব্যক্তির আত্মদান সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতাকে বহন করে আনবে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ সেদিন অসম্ভব হয়ে উঠবে।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

বলরাজ

কমাণ্ডার-ইন-চিফ।"

সভার হলের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ ও ধোঁয়ায় এবং ত্রস্ত দর্শকের ঠেলা-ঠেলিতে সেদিন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে ভগৎ সিং ও দত্ত'র পালিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল। কিন্তু তাঁরা পরিকল্পনা করে-ছিলেন ধরা দেওয়ার। তাই তাঁরা স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যতক্ষণ না সার্জেণ্ট টেরি এসে দু'জনকে গ্রেপ্তার করলো। টেরিকে সাহায্য করতে এল ইনস্পেক্টর জনসন। ভগৎ সিং জনসনের ব্যস্ততা দেখে বললেন—"চিন্তার কারণ নেই। আমরাই সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দেব যে, আমরা একাজ করেছি।"

ভগৎ সিংকে যখন গ্রেপ্তার করা হল তখন তিনি হাতে একটি রিভলভার ধরেছিলেন। সার্জেণ্ট টেরির উক্তি থেকে জানা যায় যে, এই রিভলভার থেকে তিনি শূন্যে দুই রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েছিলেন, কিন্তু কাউকে আঘাত করেননি।

বোমা বিস্ফোরণের ফলে চার ব্যক্তি সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন বলে চিফ কমিশনারের রিপোর্টে বলা হয়। এই চারজন হলেন [১] জর্জ স্যুস্টার, [২] বোমানজী দালাল, [৩] এস এন. রায়, [৪] পি. আর. রাও।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরকে প্রথমে চাঁদনি-চক কোতোয়ালিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে দিল্লীর সিভিল লাইনস পুলিস স্টেশনে।

এই ঘটনার পর অ্যাসেম্বলি সেসন স্থগিত রাখা হয়। সমস্ত দেশে এই বোমা বিস্ফোরণের কাহিনী পলকের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত'র ছবি ছাপা হল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ভারতবর্ষের মানুষ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনে গেল দু'টি তরুণের কাহিনী। কাগজে কাগজে ছাপা হল: ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

॥ ষোল ॥

আগেই বলা হয়েছে যে, আগ্রায় বোমা তৈরীর প্রধান ঘাঁটি করা হলেও পরে লাহোরে একটি এবং সাহারানপুরে একটি শাখা খোলা হয়। লাহোরে ম্যাকলিওড রোডে কাশ্মীরী বিল্ডিংয়ে একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয় ভগবতী-চরণ ভোরার নামে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক থাকেন শুকদেব। আর সাহারানপুর কারখানা থাকে শিব বর্মার জিম্মায়।

শুকদেব বোমা তৈরীর কয়েকটি উপকরণের জন্যে স্থানীয় একটি দোকানে যোগাযোগ করেছিলেন। এই সূত্রটি পুলিস পায় ও পরে শুকদেবের অনুসরণ করে কাশ্মীরী বিল্ডিংয়ের কারখানা আবিষ্কার করে। ১৫ই এপ্রিল সকালে পুলিস এই কারখানা-ঘরটি ঘিরে ফেলে। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে—শুকদেব, জয়গোপাল ও কিশোরীলাল।

এই ঘরে পুলিস খুঁজে পেলো—একটি তাজা বোমা, আটটি খোল, বোমা তৈরীর মালমসলা, বোমা তৈরীর বিবরণসহ নোটবই, একটি পিস্তল এবং বি. কে. দত্তর একটি ছবি।

এদিকে লাহোরের পথে পথে পোস্টার পড়ছে, Loud voice to make the deaf hear.

হিন্দুস্থান টাইমস-এর অফিসে, দিল্লীর পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর কাছে অনামা চিঠি আসতে লাগলো। কয়েকটি চিঠি 'এইচ. এস. আর. এ'র পক্ষ থেকে লেখা। তাতে পুলিস ও সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সমস্ত পাঞ্জাবে এবং দিল্লীতে এক তুমুল উত্তেজনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধৃত জয়গোপাল পুলিসের কাছে একটি বিবৃতি দিয়ে বসলো, যার ফলে পুলিস দলটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেল। ১৩ই মে তারা সাহারানপুরের আড্ডায় তল্লাশী চালালো এবং পুলিসের হাতে পড়লো ৬টি বোমা, ৩টি খোল এবং ৩টি পিস্তল। শিব বর্মাকে পুলিস গ্রেপ্তার করলো। শিব বর্মাও পুলিসের হাতে একটি বিবৃতি দিলেন। জয়গোপালের বিবৃতির ওপর নির্ভর করেই পুলিস লাহোর থেকে হংসরাজ ভোরা এবং সাহারানপুর থেকে জয়দেব কাপুর, গয়াপ্রসাদ ও শিব বর্মাকে গ্রেপ্তার করে। শিবরাম রাজগুরুকে পুনার একটি গ্যারেজ থেকে রিভলভার সমেত গ্রেপ্তার করা হয় ৩০শে সেপ্টেম্বর। মামলা শুরু হলে জয়গোপাল ও হংসরাজ সরকারের পক্ষে অ্যাপ্রুভার হয়ে যায়।

সিভিল লাইনস পুলিস স্টেশন থেকে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরকে দিল্লী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। দিল্লী জেলে পিতা কিষাণ সিং ভগৎ-এর সংগে দেখা করতে আসেন। আগেই ভগৎ চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা যেন একাই আসেন।

কিষাণ সিং ভগৎকে জানান যে, ভগৎ-এর ছোট ভাই কুলতারকেও পুলিস অ্যারেস্ট করেছে। কুলতারের বয়স তখন ১০।১১। ভগৎ পিতাকে অনুরোধ করেন, তাঁর জন্য যেন অকারণ অর্থব্যয় না করা হয়।

১৯২৯ সালের ৭ই মে দিল্লীর অতিরিক্ত জেলাশাসক এফ. বি. পুলের এজলাসে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে অভিযুক্ত করা হয়। দিল্লী জেল থেকে ম্যাজিস্ট্রেট-এর এজলাস পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা পুলিসে ঘিরে রাখে। তাছাড়াও অজস্র সি. আই ডি অফিসার এবং উর্ধতন পুলিস কর্মচারী সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঘুরতে থাকে। আসামীপক্ষ সমর্থন করতে আসেন আসফ আলি। সাড়ে ন'টায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর কোর্টে আসেন। আর ১০টা ৮ মিনিটে ভগৎ সিং ও দত্তকে নিয়ে আসা হয়। কোর্টে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিসেস আসফ আলি, কিষাণ সিং, মাতা বিদ্যাবতী এবং অজিত সিং-এর স্ত্রী।

কোর্টে প্রবেশ করা মাত্র ভগৎ সিং চিৎকার করে বললেন, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্।'

বটুকেশ্বরের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্।

কোর্টের মধ্যে তাঁদের দু'জনার হাতেই হাতকড়া পরিয়ে রাখা হল।

পরের দিন ৮ই মে আবার তাঁদের আনা হল। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর আগের দিনের মতই উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিলেন। তাঁদের বিবৃতি চাওয়া হলে তাঁরা বলেন যে, পরে ভেবে দেখা হবে। অতঃপর দু'জনের বিরুদ্ধেই ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০৭ ধারা অনুযায়ী এবং ৩ ধারা অনুযায়ী মামলা খাড়া করা হল। অর্থাৎ অভিযোগে বলা হল যে, সভায় হত্যার উদ্দেশ্যেই আসামীরা বোমা ছুঁড়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর ডি প্যাট্রিক তাঁর নোটে লিপিবদ্ধ করেন—By the end of October '28 Shiv Varma was summoned to Agra where he found B. K. Sinha. Panditji (definitely said by him to be identical with the absconding Kakori accused Chandra Sekhar

Azad) and either Raghunath or Bhagat Singh. some time after the Calcutta Congress, probably early in January, the talk first took place at the preparation of bombs and by about February 29th articles for the preparation of explosives had been procured, while Sukhdeb brought 5 or 6 shells of which 5 were afterwards loaded before the end of February. (Note : this house was discovered by the police before Shiv Varma's statement and was formd to be plentifully splashed with picric acid etc.) About the same time a house was hired in Delhi.

(১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে শিব বর্মাকে আগ্রায় ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে শিব বর্মার সঙ্গে যাদের দেখা হয়, তাদের নাম বিজয়কুমার সিংহ, পণ্ডিতজী (সুনিশ্চিতভাবেই কাকোরী মামলার অভিযুক্ত আসামী চন্দ্রশেখর আজাদ বলে বর্ণিত) এবং রঘুনাথ অথবা ভগৎ সিং। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের কিছুদিনের মধ্যেই জানুয়ারির প্রথম দিকেই বোমা তৈরি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। ফেব্রুয়ারির ২৯ তারিখের মধ্যেই বিস্ফোরক বোমা তৈরির উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়। শুকদেবই পাঁচ ছ'টি বোমার শেল নিয়ে আসে ; তার মধ্যে পাঁচটি ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি ভরতি করা হয়। (এই বাড়িটি শিব বর্মা তাঁর বিবৃতি দেওয়ার আগেই পুলিসের খবরে আসে। বাড়িটিতে পুলিস প্রচুর পরিমাণে পিক্রিক অ্যাসিড আবিষ্কার করে।) ঠিক একই সময়ে দিল্লীতেও একটি বাড়ি নেওয়া হয়।)

স্বরাষ্ট্রসচিব জেমস ক্রিরার (James Crerar) ভারতসচিব Sir Arthur Hirtzel-কে যে বিবরণী দেন, তাতে লেখেন—There is no doubt that a series of successful outrages might have a damaging moral effect both on Government servants and on the public generally and that effect would be intensified if the perpetrators of the outrages were not immediately detected and dealt with. We have had some evidence of this on a small scale in the

events of the recent months. The failure for sometime to make any progress with the detection of the murderer of Saunders undoubtedly had an unsettling effect in the Punjab, and the sensation caused by the throwing of the bombs in the assembly produced for a short time an impression on public opinion, if not an admiration at least, that those who could perform such deads were a power to be reckoned with. It seems to us abundantly clear that, if terrorist outrages commenced on a large and conspicuous scale, prompt and drastic action would be required on the part of the Government.

॥ সতের ॥

সেসন কোর্টে ১৯২৯ সালের ৬ই জুন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত তাঁদের জবানবন্দী দিলেন। আসামীদের তরফে সেই জবানবন্দী পাঠ করলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার আসফ আলি। এই জবানবন্দীটি নানাকারণে একটি ঐতিহাসিক দলিলের মূল্য পেয়েছে। এর মধ্যে ভগৎ সিং'এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আদর্শবাদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। আসফ আলি সাহেব পুরো বিবৃতিটি দেখে দেন ; এবং হয়তো কোথাও সামান্য অদলবদল করে থাকতে পারেন। কিন্তু জবানবন্দীর ভাব ও ভাষা মোটা-মুটি ভগৎ সিং'এর। এর মধ্যেই ভগৎ সিং'এর বিপ্লবী জীবনের দর্শন বিধৃত আছে বলে পুরো বিবৃতির অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত তাঁদের বিবৃতিতে বললেন :

"আমরা আজ বিশেষ কয়েকটি অভিযোগে অভিযুক্ত। আমরা যা করেছি, তা কেন করেছি সে কথা বুঝিয়ে বলা দরকার বলে মনে করছি।

প্রথমেই এই প্রশ্নগুলি মনে জাগতে পারে—

(১) হলের মধ্যে বোমা ফেলা হয়েছিল একথা কি ঠিক ? যদি হয়ে থাকে, তবে কেন হয়েছিল ?

(২) নিচের আদালতে আমাদের নামে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা সত্য? অথবা সত্য নয়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলবো, হ্যাঁ বোমা ফেলা হয়েছিল। তবে কিছু সংখ্যক তথাকথিত প্রত্যক্ষ দর্শক মিথ্যা ও সাজানো ঘটনা বর্ণনা করায় আমরা মনে করি যে, আমাদের বিবৃতির যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, সার্জেণ্ট টেরির সাক্ষ্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। টেরি বলেছে যে, আমাদের কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা যখন ধরা দিচ্ছি তখন আমাদের কারও কাছেই পিস্তল ছিল না। অন্য যে সব সাক্ষী বলেছেন যে, আমরা বোমা ছুঁড়েছিলাম, তারাও মিথ্যা কথনে দ্বিধা করেন নি। যাঁরা বিচারের সততা ও নিষ্ঠার কথা ভাবেন, তাঁদের কাছে এই ঘটনাগুলির স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দিতে আমাদের উদ্দেশ্যকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। আমরা যা বলতে বা করতে চেয়েছি এবং যা এখন ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে করি।

জেলের মধ্যে কয়েকজন পুলিস অফিসার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা জানালেন যে, সংসদের যুক্ত অধিবেশনে লর্ড আরউইন এই ঘটনাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আক্রমণমূলক ঘটনা বলে মনে করেন না। আরউইন বলেছেন যে, তিনি এই ঘটনাকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে মনে করেছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানলাম যে, আরউইন এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন।

আমরা বলতে চাই যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই; মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাদের কারও চেয়ে কম নয়। মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র ও মূল্যবান বলে মনে করি।

অত্যন্ত বিনীতভাবে আমরা জানাতে চাই যে, আমরা ইতিহাসের ছাত্র ছাড়া আর কিছু নই। শঠতাকে আমরা ঘৃণা করি। আমাদের প্রতিবাদ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, যে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অক্ষম হিসাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেনি, উপরন্তু তার ক্ষতি করবার ক্ষমতা যে অপরিসীম, তার প্রমাণও উপস্থাপিত করেছে। আমরা অনেক ভেবে দেখেছি যে, ভারতের অসহায়তা ও দুর্গত অবস্থাকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরাই

এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। এক দায়িত্বজ্ঞানহীন ও স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার সংগে এই প্রতিষ্ঠান জড়িত। জাতির পক্ষ থেকে যতবারই দাবি জানানো হয়েছে ততবারই জাতির প্রতিবাদপত্র ছেঁড়া কাগজের বাক্সে ফেলা হয়েছে।

Solemn resolution passed by the house have been contemptuously trampled under foot on the floor of the so-called Indian Parliament. Resolution regarding the repeal of the repressive and arbitrary measures have been treated with sublime contempt, and the Government measures and proposals, rejected as unacceptable by the elected members of the legislatures, have been restored by a mere stroke of the pen. In short, we have utterly failed to find any justification for the existence of an institution which despite all its pomp and splendour, organised with the hard-earned money of the sweating millions of India is only a hollow show and a mischievous make-believe...

অর্থাৎ—"আইন সভায় যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলিকে তথাকথিত ভারতীয় পার্লামেণ্টে অবজ্ঞার সংগে পদদলিত করা হয়েছে। দমনমূলক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা রদের জন্য গৃহীত প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সংগে উড়িয়ে দিয়ে সরকারী যে সকল নীতিকে আইনসভার সভ্যরা বাতিল করতে চেয়েছেন, সেগুলিকে কলমের একটি খোচায় উজ্জীবিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে গঠিত যে শাসন-কাঠামো শুধু খামখেয়ালি বিলাসিতা চরিতার্থ করেছে, যার অস্তিত্ব ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য এবং ক্ষতিকর ছলনার ভান মাত্র, তাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন যুক্তিই আমরা খুঁজে পাই না। ভারতবর্ষের অসহায় পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে গড়ে তোলা শাসন প্রদর্শনীর জন্য সরকারী অর্থ যে ভাবে ব্যয় করা হয়, এবং যে সকল নেতা জনসাধারণের অর্থকে অপচয়িত হতে শাসন-যন্ত্রকে সাহায্য করেন, তার পুরোটাই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে।

"আমরা এই সমস্ত ঘটনার পুনরুল্লেখ করছি ; এবং সংগে সংগে শ্রমিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত নেতাদের গ্রেপ্তারের কথাও স্মরণ করছি।

শ্রম সম্পর্কিত বিলটি অ্যাসেম্বলিতে উপস্থাপিত করার পর বিলটিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক উঠেছে আমরা তার গতি ও প্রকৃতিকে লক্ষ করেছি। আমাদের ধারণা হয়েছে যে, যে শাসনব্যবস্থা শোষকসমাজের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং অসহায় শ্রমিক সমাজের দাসত্বকে কায়েম করতে চেয়েছে, তার কাছ থেকে আশা করবার মত আমাদের কিছু নেই।

"সবশেষে আমাদের বলার কথা এই যে, সমগ্র দেশের যাঁরা প্রতিনিধি তাদের প্রতি অমানবিক ও বর্বর অত্যাচার এবং অবমাননা করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশের অভুক্ত ও মেহনতী মানুষের উপার্জন ও আর্থিক উন্নয়নের পথগুলিকে রুদ্ধ করে দিয়ে সাধারণ অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আমাদের মত যারা এই অসহায় মজুরদের দুর্ভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করেছে, তারা কেউই স্থির থাকতে পারে না। যারা দেশের বুনিয়াদ গড়ে তুলবার জন্য নিঃশব্দে তাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, তাদের বুক বিদীর্ণ করে ওঠা কান্নাকে কোন সহৃদয় মানুষই স্তব্ধ করে দিতে এগোবে না।

"গভর্নর জেনারেলের এগজিকিউটিভ কাউন্সিল'এর ল'মেম্বার ছিলেন এস. আর. দাশ। একদা তিনি তাঁর পুত্রকে চিঠি লিখেছিলেন—ইংল্যাণ্ডকে তার স্বপ্নের ঘোর থেকে জাগাবার জন্যে বোমার প্রয়োজন ছিল। অ্যাসেম্বলি-ভবনের মাঝখানে আমরাও বোমা ফাটিয়েছিলাম আমাদের প্রতিবাদকে মুখর করে তোলবার জন্যে ; আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বধিরকে শোনানো, এবং যারা বেপরোয়া তাদের সতর্ক করা। আমাদের মত অন্যেরাও আজ গভীরভাবে অনুভব করছে যে, ভারতের এই বিশাল জনসমুদ্রের আপাত নিঃশব্দ তলদেশে ঝড় উঠবার সংকেত এসেছে। যারা আজ সামনের প্রবল বিপদকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সতর্ক করার জন্যই আমরা বিপদবার্তাসূচক পতাকা উত্তোলিত করেছি। আমরা শুধুমাত্র এক অবাস্তব অহিংস চিন্তার অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করেছি ; অহিংসার ধ্বনি যে নিরর্থক সে কথা আগামী দিনের মানুষ অসন্দিগ্ধ চিত্তেই জেনেছে।

"অহিংসাকে আমরা কেন অবাস্তব বলে বর্ণনা করলাম, তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। শক্তিকে যখন নিছক আঘাতের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন তা হল হিংস্রতা। তার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। কিন্তু

নীতিসম্মত কোন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যখন শক্তির প্রয়োগ করা হয়, তখন তার নৈতিক সমর্থন আছে। শক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে চাওয়া অবাস্তব কল্পনা। আমাদের দেশে যে নব আন্দোলন জেগে উঠেছে, আমরা যার সূচনা মাত্র দিয়েছি, তার মূলে আদর্শবাদের প্রেরণা আছে। আর সে আদর্শ আমরা পেয়েছি গুরু গোবিন্দ সিং ও শিবাজীর কাছে; কামাল পাশা ও রিজা খাঁর কাছে; ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, লাফায়েত এবং লেনিনের কাছে।

"বিদেশী সরকার এবং আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেই দেশের এই জাগরণের সাড়াকে চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কাজেই আমরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাইলাম এমন ভাবে, যাতে আমাদের কথা সকলের কানেই প্রবেশ করে।

"অ্যাসেমব্লির কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। আমরা বারবার বলেছি এবং বলছি যে, মানুষের জীবনকে আমরা মূল্যবান ও পবিত্র বলে মনে করি। কারুকে ব্যক্তিগতভাবে কোন আঘাত করার চেয়ে বরঞ্চ আমরা আমাদেরই জীবন উৎসর্গ করবো। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়োজিত সৈন্যরা নির্বিচারে হত্যা করার জন্যই প্ররোচিত হয়। আমরা মানবতার পূজারী, মানুষের জীবন রক্ষা করা কর্তব্য বলে মনে করি। তবু আমরা স্বেচ্ছায় অ্যাসেমব্লি-ভবনের ভেতরে বোমা ফাটিয়েছি। একটি ঘটনার ব্যাখ্যা তার পরের ঘটনাগুলির দ্বারাই হবে, কল্পনা বা অনুমানের দ্বারা নয়। আমাদের কাজের বিচার হবে, তার দূরপ্রসারী সম্ভাবনার দ্বারা।

"অ্যাসেমব্লি-ভবনের মধ্যে যে বোমা ফেলা হয়েছে তার দ্বারা একটি খালি বেঞ্চি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর জনা পাঁচ ছয় লোকের গায়ে সামান্য আঁচড় লেগেছে। সরকারী বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাক্ষ্যে বলেছেন যে, দৈবক্রমে সকলে বেঁচে গেছে। কিন্তু তাঁদের অতিরঞ্জন বাদ দিলে এটা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক নিয়মেই ঘটেছে। প্রথমতঃ দু'টি বোমা ফাটানো হয়েছে একেবারে ফাঁকা জায়গায়। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন, যেমন পি. রাও, শংকর রাও, জর্জ স্যুস্টার—তাঁরা হয় মোটেই আহত হননি, আর নইলে সামান্য আঁচড় খেয়েছেন। সরকারী বিশেষজ্ঞরা যে ধরনের বোমার বর্ণনা দিয়েছেন সে ধরনের বোমা ব্যবহার করলে অনেক লোকের জীবনহানি হতে পারতো।

"বোমাগুলিকে ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরকে ভরতি করলে তার দ্বারা ব্যবস্থাপক

সভার বেশীর ভাগ সভ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেত। আমরা বোমাগুলি সরকারী সভ্যদের আসনের দিকেও নিক্ষেপ করতে পারতাম। স্যর জন সাইমনও প্রেসিডেণ্টের গ্যালারিতে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর কমিশন সর্বত্র শুধু ঘৃণা কুড়িয়েছে। ইচ্ছা হলে আমরা তাঁকেও উড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এগুলি আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না। আমরা বোমার দ্বারা যেটুকু করতে চেয়েছিলাম, সেইটুকুই শুধু করেছিলাম। দৈব বলে যদি কিছু থাকে, তবে ছিল আমাদের নির্দিষ্ট ইচ্ছায়। তাই বোমার আঘাতে কারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি।

"আমরা যা করেছি তার জন্য শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি বলেই আমরা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি। আমরা জানাতে চেয়েছি যে, ব্যক্তিবিশেষকে ধ্বংস করে আদর্শকে নাশ করা যায় না। দু'টি নগণ্য জীবনকে নাশ করে একটি জাতিকে দলিত করা যায় না। আমরা সেই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি, যা অলঙ্ঘনীয়। আভিজাত্যের নিদর্শন এবং দুর্ভেদ্য বাস্তিল কারাগার ফরাসীদেশের বিপ্লবকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ফাঁসীকাঠ আর সাইবেরিয়ার নির্বাসন রুশবিপ্লবকে দমন করতে পারেনি। আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি যুদ্ধকেও রক্তপাত ও দমন-নীতিতে রোধ করা যায়নি।

"ভারতবর্ষের মুক্তির অগ্নিশিখা কি অর্ডিন্যান্স আর নিরাপত্তা বিলের আড়ালে চাপা পড়বে? ষড়যন্ত্রের মামলা দাঁড় করিয়ে কিম্বা তরুণদের কারারুদ্ধ করে বিপ্লবের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করা যাবে না। কিন্তু এই সতর্ক বাণীকে শুভবুদ্ধির সংগে বিবেচনা করলে হয়তো অনেক অত্যাচার ও প্রাণহানির সম্ভাবনাকে কমানো যাবে।

আমরাই এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি, এবং আমাদের কাজও আপাততঃ শেষ।"

বিপ্লব শব্দের অর্থ তাঁরা কি বোঝেন, এ'প্রশ্নের উত্তরে ভগৎ সিং বললেন—

"বিপ্লব অর্থে সবসময়েই এক রক্তক্ষয়ী লড়াই বোঝায় না; বিপ্লবের মধ্যে ব্যক্তি বা দলবিশেষের প্রতিহিংসা পূরণের অবকাশও নেই। বিপ্লব মানে বোমা বা ছোরাছুরি নয়। বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি যে, বর্তমান যে ব্যবস্থার মূলে এক প্রত্যক্ষ অবিচার রয়ে গেছে, তার আমূল পরিবর্তন। যারা দ্রব্য উৎপাদন করছে অথবা সমাজের জন্য শ্রমদান করছে সমাজে তাদের যোগ্য স্থান থাকা উচিত। কিন্তু তারাই প্রবঞ্চিত হচ্ছে

তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে ; এমনকি প্রাপ্য মূল্য থেকেও। যে চাষী দেশের খাদ্য জোগায়, সে নিজে সপরিবারে উপোস করে ; যে তাঁতি সকলের জন্য কাপড় বোনে, তার নিজের পরবার বস্ত্র কোনদিনই জোটে না। রাজমিস্ত্রী, কামার, ছুতোর, যারা বিরাট বিরাট প্রাসাদ গড়ে তোলে, তাদের নিজেদের বাসের জন্য ঘর জোটে না। ধনিক ও শোষক শ্রেণী সমাজে আগাছা মাত্র ; অথচ তারাই খেয়াল চরিতার্থ করতে মুঠো মুঠো টাকা ওড়ায়। এই ভয়াবহ বৈষম্যের ফলে সমাজে চরম বিশৃংখলা আসতে বাধ্য। এই অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। সমাজের মুখে চোখে যে আলো আজ দেখছি, তা এক আগেনয়গিরির জবলন্ত লাভা থেকেই আসছে।

সভ্যতার যে হর্ম্যচূড়া আজ গড়ে তোলা হয়েছে, সময়মত বাঁচানো না গেলে, তা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে। কাজেই সবকিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার। যারা এ সত্য উপলব্ধি করেছে তাদের কর্তব্য সমাজবাদের পথে সমাজকে পুনর্গঠিত করা। যদি তা না করা হয়, মানুষের হাতে মানুষের এবং একটি জাতির দ্বারা অপর একটি জাতির শোষণ যদি চলতে থাকে, তাহলে যে নিপীড়ন ও হত্যাকান্ড আজ ঘটে চলেছে, তাকে রোধ করাও সম্ভব হবে না।

বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি, এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যা ভংগুর হবে না এবং শোষিত জনগণের প্রভুত্ব যেখানে স্বীকৃত হবে ; এমন একটি বিশ্বসংগঠনের সৃষ্টি, যা মানবতাকে ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করবে।

এই হল আমাদের আদর্শ। আর এই আদর্শবাদের প্রেরণা থেকেই আমরা সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে আমাদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের কথায় যদি কেউ ভ্রূক্ষেপ না করে, এবং স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিকে অবরোধ করে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাই যদি চলতে থাকে, তা হলে অদূর ভবিষ্যতে এক সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু হবে। সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করে বিপ্লবের আদর্শকে রূপায়িত করা এবং অবহেলিত শোষিত মানুষকে শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করাই সে সমাজের লক্ষ্য হবে। বিপ্লব মানব সমাজের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ; স্বাধীনতায় তার জন্মগত অধিকার। শারীরিক শ্রম যারা দেয়, তারাই সমাজের স্তম্ভ। সাধারণ মানুষের সার্বভৌমত্বই সমাজের পরিণতি।

এই আদর্শের জন্য যে কোন নির্যাতন সহ্য করতে আমরা প্রস্তুত। বিপ্লবের বেদিমূলে আমরা ধূপের মত নিজেদের অর্ঘ্য দিতে এসেছি। এই

মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য কোন ত্যাগই আমাদের কাছে কঠিন নয়। আমরা সুখী যে, বিপ্লবের পদধ্বনি আমরা শুনতে পেয়েছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্‌।"

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর এই যুক্ত জবানবন্দী প্রথমে 'পায়োনীয়ার' এবং তারপরে প্রায় সকল কাগজেই ছাপা হল। ভগৎ সিং চেয়েছিলেন যে, তাঁদের কথা সকলের কাছে পৌঁছে যাক। তাঁর সেই ইচ্ছা অন্ততঃ পূর্ণ হল।

১০ই জুন দিল্লী বোমার মামলার শুনানী শেষ হল। বিচারক তাঁর রায় দিলেন ১২ই জুন। বিচারকের রায়ে বলা হল—

"একথা আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভগৎ সিং প্রথম বোমাটি ছুঁড়েছিলেন মৃত্যু ঘটানোর জন্য অথবা মৃত্যু ঘটতে পারে এমন আঘাতের জন্য। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, অনুরূপ উদ্দেশ্যেই তিনি জর্জ স্যুস্টার, পি. আর. রাও এবং শংকর রাও-এর দেহে আঘাত ঘটিয়েছেন। এই ঘটনাগুলি আই. পি. সি.'র ৩০৮ ধারায় শাস্তির যোগ্য। এর জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত অপরাধগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো, যার দ্বারা অবৈধভাবে বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে অন্যের জীবনহানি ঘটানোই প্রমাণ হয়। এই অপরাধ এক্সপ্লোসিভ সাবসট্যানসেস অ্যাক্ট ১৯০৮-এর তিন ধারায় শাস্তির যোগ্য।

এও আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, বটুকেশ্বর দত্ত দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন একই উদ্দেশ্যে এবং তার দ্বারা তিনি এস. এন. রায় ও এ. পি. দুবেকে আহত করেছেন। তিনিও উপরোক্ত অপরাধগুলির জন্য পেনাল কোডের ৩০৭ ধারা এবং বিস্ফোরণ আইনের ৩ ধারায় দোষী।

আমি উভয় আসামীকে দোষী প্রমাণিত বলে মনে করছি এবং উদ্ধৃত পেনাল কোডের এবং বিস্ফোরক আইনের ধারাগুলি অনুযায়ী উভয়েরই দণ্ড বিধান করছি।

* * * * আমি ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিলাম।"

ভগৎ সিং তাঁর বক্তব্যকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারকে আরও দীর্ঘ করতে চেয়েছিলেন। তাই হাইকোর্টে তাঁরা আপীল করলেন। আসফ আলি অভিযুক্তদের পক্ষে সওয়াল করেন। কিন্তু হাইকোর্টের রায়ে সেসন কোর্টের রায়ই বহাল থাকে।

॥ আঠার ॥

১৯২৯ সালের ১২ই জুন তারিখে দিল্লী বোমার মামলার আসামীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সংগে সংগে ভগং সিংকে মিয়ানওয়ালি জেলে এবং বটুকেশ্বর দত্তকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হল।

জেলে তাদের দু'জনকেই 'C' ক্লাস বন্দী হিসেবে সাধারণ কয়েদীদের সংগে রাখা হল।

'C' ক্লাস বন্দীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। অতি সাধারণ অপরাধে দোষী, চোর ডাকাত ইত্যাদিকেই 'C' ক্লাসে রাখা হত। তাদের যেমন জঘন্য খাদ্য দেওয়া হত তেমনি নোংরা পরিবেশে রাখা হত।

অথচ শ্বেতাংগ ব্যক্তিদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। ভগং সিং এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালেন। তার ফলস্বরূপ তাঁর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। নিরুপায় হয়ে ভগং সিং ও দত্ত লিখিত প্রতিবাদ জানালেন এবং ১৫ই জুন থেকেই দু'জনে স্বতন্ত্রভাবে অনশন শুরু করলেন।

স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে ভগং সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত যে স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র পাঠান, তা পরবর্তীকালে লাহোরের 'দি পীপল' পত্রিকায় ছাপা হয়। এখানে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

"আমরা ভগং সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় বোমা ফেলার মামলার আসামী হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মামলা চলার সময়ে আমরা যতদিন দিল্লী জেলে ছিলাম, আমরা ভালো ব্যবহার পেয়েছি এবং ভালো খাবারও আমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেদিন থেকে আমাদের মিয়ানওয়ালি ও লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হল, সেদিন থেকেই আমাদের সাধারণ অপরাধে আটক কয়েদীদের সংগে একই ভাবে রাখা হচ্ছে। প্রথম দিনই আমরা এর প্রতিবাদ করি এবং যে খাবার আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তা গ্রহণে অসম্মত হই।

"আমরা যে সব সুবিধাগুলি চেয়েছি, সেগুলি আবার উদ্ধৃত করছি—

১. আমাদের মত রাজনৈতিক বন্দীদের দেয় খাদ্যতালিকার উৎকর্ষ

সাধন করতে হবে। ইউরোপীয় বন্দীদের যে মানের খাদ্য দেওয়া হয়, আমাদেরও সেই মানের খাদ্য দিতে হবে।

২. আমাদের জোর করে কোন অসম্মানকর কার্যে নিয়োগ করা চলবে না।

৩. সরকারী নিষেধাজ্ঞা নেই, এমন ধরনের যে কোন বই পড়বার অনুমতি আমাদের দিতে হবে। লেখার জন্য কাগজ কলম ইত্যাদি উপকরণের ওপর কোন বাধা বা নিষেধ রাখা চলবে না।

৪. অন্ততঃ একটি দৈনিক পত্রিকা প্রত্যেক বন্দীকেই পড়তে দিতে হবে।

৫. ইউরোপীয় বন্দীদের মত রাজনৈতিক বন্দীদেরও একটি স্বতন্ত্র পরিবেশে রাখতে হবে।

৬. তেল সাবান ইত্যাদি উপকরণগুলি আমাদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য দিতে হবে।

৭. ভদ্র বেশ ধারণ করতে দিতে হবে।

"আমরা মনে করি যে, আমাদের এই দাবিগুলি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের বলেছেন যে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের এই দাবিগুলি মানতে রাজী নন। উপরন্তু তারা আমাদের সংগে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। ১০ই জুন তারিখে খাওয়ানোর জন্য শারীরিক নির্যাতন করায় ভগৎ সিং অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা এই ধরনের ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

"সবশেষে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, উত্তর প্রদেশ জেল কমিটির পক্ষ থেকে পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ ও হিদায়েৎ হোসেন রাজনৈতিক বন্দীদের উচ্চশ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমাদের অনুরোধ, তাঁদের এই সুপারিশগুলিকে কার্যকর করা হোক।

"পুনশ্চঃ, রাজনৈতিক বন্দী বলতে আমরা তাঁদের সকলকেই বোঝাতে চাচ্ছি যাঁরা রাজার বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে অপরাধী। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, যাঁরা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন বা কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ড পেয়েছেন, তাঁদের সকলকেই রাজনৈতিক বন্দী বলতে হবে।"

১৪ই জুন তারিখে ধরা পড়লেন যতীন্দ্রনাথ দাস। কলকাতা থেকে তাঁকে লাহোরে নিয়ে আসা হল।

২৫শে জুন ভগৎ সিংকে মিয়ানওয়ালি জেল থেকে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে সরিয়ে আনা হল। ৩০শে জুন তাঁরা জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট'এর কাছে তাঁদের দাবিগুলি উপস্থাপিত করলেন।

৩০শে জুন জালিয়ানওয়ালাবাগে ড. কিচলুর সভাপতিত্বে নওজোয়ান ভারত সভা অনশন ব্রতীদের সমর্থনে এক জনসভার আয়োজন করে। এই সভায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর কথা আলোচনা করেন দেওকিনন্দন চরণ এবং মাস্টার মোটা সিং।

১লা জুলাই তারিখের 'লিবার্টি' পত্রিকায় খবর বেরোল, "The under-trial prisoners in the Lahore Conspiracy Case who were in police custody in Lahore, observed fast yesterday in sympathy with Dutt and Bhagat Singh."

শুধু পাঞ্জাবে নয় পেশোয়ার দিল্লী কলকাতা সর্বত্রই জনসভায় অভিনন্দন জানানো হল অনশনব্রতী বিপ্লবীদের। লাহোরে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি ছিলেন সর্দার শার্দুল সিং; কলকাতায় তারাসুন্দরী পার্কের সভায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

পয়লা জুলাই তারিখে মামলার অন্যতম আসামী যতীন্দ্রনাথ দাসকে অতিরিক্ত জেলাশাসকের আদালতে উপস্থিত করা হয়। আদালতে যতীন্দ্রনাথ তদন্তকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আনেন। তাঁকে সেখান থেকে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেল হাজতে যতীন দাসকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়। তাঁর জামিনের আবেদনও নামঞ্জুর করা হয়। উপরন্তু তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে রাখা হয়।

২রা জুলাই ললিতকুমার মুখার্জিকে এবং ৩রা জুলাই অজয় ঘোষকে তাঁদের এলাহাবাদের স্বরাজভবন থেকে বন্দী করা হল। ৪ঠা জুলাই গ্রেপ্তার করা হল জিতেন্দ্রনাথ সান্যালকে। তিনি কাকোরি মামলার দণ্ডিত আসামী শচীন্দ্রনাথের ছোট ভাই। ৫ই জুলাই জওহরলাল নেহেরু একটি বিবৃতি দিয়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর অনশনে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে এই আশা প্রকাশ করলেন।

॥ উনিশ ॥

১৯২৯ সালের ১০ জুলাই। স্যান্ডার্স হত্যা ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুরু হল সেণ্ট্রাল জেলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট রায়সাহেব শ্রীকিষণ-এর এজলাসে। লরেন্স গার্ডেন পর্যন্ত জেল প্রবেশের সবগুলি রাস্তাতেই কড়া পুলিস পাহারা বসানো হল।

মামলায় যাঁদের অভিযুক্ত করা হল, তাদের নাম :

১	শুকদেব	লাহোরে বোমার কারখানায় গ্রেপ্তার হন
২.	শিব বর্মা	সাহারানপুরে ” ”
৩.	গয়াপ্রসাদ	” ” ”
৪.	কিশোরীলাল রতন	হোসিয়াবপুরে ” ”
৫.	জয়দেব কাপুর	সাহারানপুরে ” ”
৬.	যতীন্দ্রনাথ দাস	কলকাতায় ” ”
৭.	ভগৎ সিং	দিল্লী বোমার মামলার আসামী
৮.	কমলনাথ তেওয়ারি	কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র
৯.	বটুকেশ্বর দত্ত	দিল্লী বোমার মামলায় দণ্ডিত
১০.	জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল	এলাহাবাদ
১১.	আজ্ঞারাম	শিয়ালকোট
১২.	দেশরাজ	লাহোর DAV কলেজের ছাত্র
১৩.	প্রেমদত্ত	” ”
১৪.	এস. এন. পাণ্ডে	কানপুর
১৫.	মহাবীর সিং	এটোয়া
১৬.	অজয় ঘোষ	এলাহাবাদ
১৭.	শিবরাম রাজগুরু	পুনা

পলাতক অথচ অভিযুক্তদের তালিকায় ছিলেন—ভগবতীচরণ ভোরা, যশপাল, বিজয়কুমার সিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদ, কৈলাসপতি ও সৎগুরু দয়াল অবস্থি।

যারা রাজসাক্ষী হয়ে যাওয়ায় অভিযুক্তদের তালিকা থেকে বাদ গেল তাদের নাম—জয়গোপাল, হংসরাজ, রামশরণ দাস, ললিত মুখার্জি, ব্রহ্ম দত্ত, ফণী ঘোষ ও মনমোহন ব্যানার্জী।

সিনিয়ার পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হার্ডিং'এর অভিযোগে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১, ১২১এ, ১২২ ও ১২৩ ধারায় এই মামলা দু'টি দাঁড় করানো হয়।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্ডিং তার অভিযোগে বললো—১৯২১ সাল থেকে লাহোরে ও বৃটিশ ভারতের নানা জায়গায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং আরও কিছু যুবক রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত রয়েছে। তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে বল প্রয়োগে বা অন্য যে কোন ভাবে দেশের আইন-সংগত সরকারকে উৎখাত করতে এবং রাজাকে তাঁর অধিকার থেকে বিচ্যুত করতে চেয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই তারা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেছে এবং নানা-স্থানে সভাসমিতি করে এবং দলগঠন করে আইনসংগত সরকারের বদলে এক ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।

এর জন্য তারা যে সব পথ বেছে নিয়েছে এবং যে কার্যক্রম গড়ে তুলেছিল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। যেমন—

১. লোক, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা,

২ এই উদ্দেশ্যে ডাকাতি, লুঠ ও অন্য নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা,

৩. হত্যা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বোমা তৈরী করা,

৪. পুলিস অথবা অন্য সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করা,

৫ সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।

এই ষড়যন্ত্রের ফলেই ১৯২৩ সালে সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টার ব্যানার্জীকে হত্যার চেষ্টা করা হয়; দলের নির্দেশে গোরক্ষপুরের বুঢ়াল-গঞ্জ পোস্ট অফিসের ক্যাশ তছরূপ করা হয়; পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের লাহোর শাখায় ডাকাতি করা হয়; এবং লাহোর পুলিস অফিসার স্যাণ্ডার্স ও কনস্টেবল চন্দন সিংকে হত্যা করা হয়। দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভার হলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে স্যর বোমানজী দালালকে আহত করা হয় ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল। অভিযুক্তরা লাহোর, সাহারানপুর, কলকাতা ও আগ্রাতে বোমা তৈরী শুরু করে।

ষড়যন্ত্রকারী এই অভিযুক্তরা ডিনামাইটের সাহায্যে ট্রেন উড়িয়ে সাইমন কমিশনের সভ্যদের প্রাণনাশ করবার চেষ্টা করেছিল। কাকোরি মামলার দুই আসামী শচীন সান্যাল ও যোগেশ চ্যাটার্জীকে উদ্ধার করার চেষ্টাও তারা করেছিল।

গভর্নমেণ্ট প্লীডার কার্ডন নোয়াড মামলার উদ্‌বোধন করে বললেন—আমি প্রথমেই একথা বলতে চাই যে, এ মামলা আইনের সাধারণ ধারায় পড়ে এবং এ মামলাকে রাজনৈতিক ঘটনার সংগে কোন ক্রমেই জড়ানো চলবে না। অভিযুক্তরা একটি বিপ্লবী দলের সভ্য। সমগ্র উত্তর ভারতেই দলটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। দিল্লীতে অগস্ট মাসের ২৮ তারিখে একটি সভায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গড়া হয়। এই মিটিংয়েই স্থির হয় যে,

১. ফণী ঘোষ (বর্তমানে রাজসাক্ষী) বিহারের ভার নেবে

২. শুকদেব পাঞ্জাবের ,, ,,

৩. শিব বর্মা ও চন্দ্রশেখর আজাদ উত্তর প্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং

৪. কুন্দন ওরফে পর্বব রাজপুতানার দায়িত্ব নেবে।

ভগৎ সিং ও বিজয়কুমার সিংহর ওপর পড়ে যোগাযোগ রক্ষার ভার।

চন্দ্রশেখর আজাদকে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অতঃপর নোয়াড অভিযুক্তদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ দেন।

অভিযুক্তদের পক্ষে দাঁড়ান লালা দুনিচাঁদ। যতীন দাসের পক্ষে সমর্থন করেন অমলক রাম, ভগৎ সিং'এর পক্ষে দাঁড়ান মেহতা আমীর চাঁদ এবং শুকদেব, মহাবীর সিং ও অন্যদের হয়ে বলেন লালা বিষেণনাথ।

॥ কুড়ি ॥

১০ই জুলাই যেদিন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুরু সেদিন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর অনশনের ২৬ দিন। জেলের মধ্যে জোর করে তাঁদের খাওয়ানোর চেষ্টা চলছিল। ১১ই জুলাই কোর্ট থেকে ফেরার পর ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরের ওপর দৈহিক নির্যাতন শুরু হয়। ডাক্তার ও জেল ওয়ার্ডাররা তাঁদের এই পীড়ন করেন। বটুকেশ্বর অচৈতন্য হয়ে যান এবং ভগৎও গুরুতর আহত হন।

১২ই জুলাই বন্দী জয়দেব কাপুর ও অন্যান্য বন্দী এই নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরের দাবির সমর্থনে অনশন আরম্ভ করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ এবং তাঁদের অনুরোধে ১৩ জুলাই থেকে যতীন দাসও অনশন গ্রহণ করলেন।

এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, লাহোর জেলে ১২ জুলাই যে সমবেত অনশনের প্রস্তাব নেওয়া হয়, তাতে একমাত্র আপত্তি জানিয়েছিলেন বন্দী যতীন দাস। ১৯২৫ সালে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় যতীন দাস অনশন করেছিলেন। তাই অনশনের কৃচ্ছ্রতা কি ভীষণ সে ধারণা তাঁর ছিল। তাছাড়া তিনি সুস্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, অনশন গভর্নমেণ্টকে নত করতে পারবে না। এবং এই বিদেশী গভর্নমেণ্ট বন্দীদের জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও দেখাবে না। অভিযুক্ত বন্দী এবং যতীন দাসের সহকর্মী বন্ধু বিজয়কুমার সিংহ পরবর্তীকালে (১৩.৯.১৯৬৬) 'ডেকান ক্রনিকল্' পত্রিকায় লেখেন,

"Among us Jatin Das was the only person who had experience of hunger-strike which he had undertaken in the Dacca Central Jail···He cautioned us about the rigours of the strike and gave us warning that unless some of us succeeded in dying in the course of the strike, the Government would not yield.···In our bubbling enthusiasm we were in no mood to listen to him."

যতীন দাস তাঁর বন্ধুদের বললেন যে, একবার অনশন আরম্ভ করলে দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন করে যাবেন ; এবং আমৃত্যু সে অনশন চলবে।

১৩ই জুলাই (১৯২৯) লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে শুরু হল সেই ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট। অনশনের মূল দাবি ছিল—লাহোর মামলার সকল বন্দীকে রাজনৈতিক বন্দী বলে গণ্য করা হোক, বন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করা হোক, এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় বন্দীদের প্রতি ব্যবহারে যে অসাম্য বর্তমান, তা দূর করা হোক।

এই অনশন ব্যক্তিগত কারণে নয়, কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্যও নয়। বিপ্লবী বন্দীদের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

কিন্তু সরকারী মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। যে কোন ভাবেই হোক রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে, বিশেষ করে যারা বিপ্লবের পথে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ চেয়েছে, তাদের দমন করতে ভারত সরকার তখন বদ্ধপরিকর।

ভাইসরয়ের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ইমার্সন ৬. ৮. ২৯ তারিখে এ সম্পর্কে ভাইসরয়ের কাছে যে নোট দেন, তাতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সরকারী মনোভাব।

ইমার্সন লেখেন—(ফাইল নং ২৪২, হোম-পলিটিক্যাল)

"অনশন ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য পাঞ্জাবের গভর্নর সাহেব আমাকে ডেকেছিলেন। আমাদের আলোচনার মূল বস্তু ছিল বিশেষ শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে। সাধারণ মানুষের কথা যদি ধরা যায় তবে হিংসাত্মক কার্যের জন্য অপরাধী বন্দীদের বিশেষ শ্রেণী-ভুক্ত করার ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীতে খাদ্য পরিবেশণ করার ব্যাপারে এবং শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের মধ্যে প্রভেদের প্রসংগে যখন বিতর্ক ওঠে তখন সাধারণ মানুষের সহানুভূতি বন্দীদের দিকেই যায়।

"লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রসংগে বলা দরকার যে, বন্দীদের অনশন ধর্মঘট ভংগ করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। বন্দীরা যেন নিজেদের হত্যা করতে কৃতসংকল্প। সাধারণ লোকও তাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে উঠছে। তাদের যে কোন একজনের মৃত্যু ঘটলে চারদিকে আবেগের বন্যা বয়ে যাবে। ফলে আমাদের উদ্দেশ্য চাপা পড়বে। যদি মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ণ জাগবে, যার ফলে আমরা অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বো।

"স্যার জিওফ্রে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল :

যারা মাঝামাঝি একটা সমাধানের কথা ভাবেন, তাদের মতের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করাই বাঞ্ছনীয়।

শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের কিছু করতেই হয়, তবে কোন একটি মৃত্যু ঘটার আগেই তা করা উচিত।

মধ্যস্থতার কোন সূত্র যদি পাওয়া যায়, তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমরা মোটামুটি ঠিক করলাম যে,

১. বিষয়টি এখন আর পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ নয়, ববং সর্বভারতীয় গুরুত্ব এসে পড়েছে এর ওপর।

২ বিশেষ বন্দীদের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে এখন আর কোন নমনীয় মনোভাব দেখানো যায় না।

৩. প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি যতক্ষণ কোন অভিমত না দিচ্ছে ততক্ষণ ভারতসরকারের পক্ষে এ ব্যাপারে কোন সুবিধা বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়।"

অনশনব্রতী বন্দীদের অবস্থার ক্রমাগতঃ অবনতি হতে লাগল। জেল কর্তৃপক্ষ পাশবিক চেষ্টায় তাদের অনশনে ভংগ করাতে চাইলেন, যার ফলে অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্পেশাল মেডিক্যাল অফিসার লাহোর জেলসমূহের ইনস্পেক্টর-জেনারেলকে ২৩ ৭ ২৯ তারিখে যে নোট দিলেন, তার মর্মার্থ হল—

নাসিকার মধ্যে ক্ষত হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ দাসকে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানো যাচ্ছে না। আগামী কাল আদালতে অন্ততঃ পাঁচজন বন্দীকে উপস্থিত করানো যাবে না। তারা হলেন—কমলনাথ তেওয়ারী, শিব বর্মা, শুকদেব, গয়াপ্রসাদ ও জয়দেব কাপুর। (ফাইল নম্বর 36/IV. Home. Pol.)

ইতিমধ্যে পাঞ্জাব কাউন্সিলের ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা ডক্টর এম. আলম ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে একটি বেতার বার্তা পাঠিয়ে জানালেন—

লেবার গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত দমন নীতির অনুসরণে পাঞ্জাবে চরম নির্যাতন শুরু হয়েছে। পাঞ্জাব সরকার তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন যাঁরা অহিংস চিন্তাধারার অনুগামী। সাধারণ মানুষের কাজে ও নিয়ন্ত্রণেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন। এর ফলাফল অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষের আশা ত পূর্ণ হলই না, উপরন্তু জেলের মধ্যে ন্যায়সংগত কারণে যারা অনশন করছেন সেই ভগৎ সিং ও বি কে দত্তর ঘটনা ম্যাকস্থইনির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আপনাকে অনুরোধ করি এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দিতে এবং ভারত সম্পর্কে উদার ও দূরদৃষ্টিপ্রসূত নীতি গ্রহণ করতে।

১৯শে জুলাই তারিখে লাহোরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী একটি শোভা-যাত্রার ওপর পুলিস লাঠি চালায়। পুলিসী নির্যাতন ও লাহোর জেলে অনশনরত বন্দীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী ভারতবর্ষের সবগুলি কাগজেই ছাপা হয়। সর্বত্রই প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। লাহোরের 'মজদুর' কাগজে লেখা হল—Discontent has been the motive force of all revolutions of the world and when this fire is fanned by repression and tyranny it acquires tremendous proportions and destroys that power that is

opposed to it. টেরেন্স ম্যাকস্থইনির মৃত্যু আয়ার্ল্যাণ্ডে যে প্রবল ঝড় তুলেছিল, যদি ভগৎ সিং ও বি. কে. দত্তর মৃত্যু ঘটে তবে ভারতবর্ষেও সেই ঝড় দেখা দেবে।

এদিকে বন্দীদের জোর করে খাওয়ানোর এবং অনশন ভঙ্গ করানোর চেষ্টা চললো। এক-একজন বন্দীকে চিৎ করে ফেলে পাঠান সিপাই দিয়ে তাদের ধরে রেখে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য প্রবেশ করানো হতে লাগলো। কিন্তু বন্দী যতীন দাসের ক্ষেত্রে এই জোর করে খাওয়ানোব (forcible feeding) চেষ্টা সফল হল না।

অনশনব্রতী বন্দীদের অন্যতম শ্রীবিজয়কুমার সিংহ ১৩. ৯. ৬৬ সালে 'ডেকান ক্রনিকল' পত্রিকায় লেখেন—

"আমাদের মধ্যে যতীন দাসই প্রথম এই জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। আমার মনে আছে দু' সপ্তাহের মধ্যেই জেলের ডাক্তার সংগে জনা আট পাঠান ওয়ার্ডার নিয়ে এলেন।

যতীন শক্তিমান যুবক। সে পাঠানদের প্রতিরোধ করল। প্রথম দিনই যতীন তাদের বাধা দিল। কিন্তু পাঠানের দলটি তাকে কাবু করে মাটিতে শুইয়ে দিল।

পরিশ্রমে যতীন ভীষণ হাঁপাতে লাগল। ডাক্তারও সেই সুযোগে রবারের নলটি ভেতরে ঢুকিয়ে দিল, আর তার ভেতরে আধসের মত দুধ ঢেলে দিল। সংগে সংগে যতীন ভীষণ জোরে কেশে উঠল। ফলে রবারের নলের ভেতরের মুখটা তার নিঃশ্বাসের নলিতে ঢুকে গেল। দুধের অর্ধেকটাই চলে গেল তার ফুসফুসে ; যতীন অজ্ঞান হয়ে গেল।"

২৭.৭ ২৯ তারিখে আই এম. এস অফিসর এন ডি পুরী আই. জি. প্রিজনস'কে নোট দিলেন—বন্দী যতীন্দ্রনাথ দাস কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানোর চেষ্টায় প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় এরকম চেষ্টার পর সে অজ্ঞান হয়ে যায়। আজ সকালে তার শরীরের তাপ ১০১ ডিগ্রী এবং নাড়ির গতি ১২০। ......মুখ দিয়ে তাকে কোন খাদ্যবস্তু বা ওষুধ খাওয়ানো যাচ্ছে না। কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করাও নিরাপদ নয়। কারণ, জোর করলে তার শরীর আরো অসুস্থ হতে পারে। তাকে বিপজ্জনকভাবে পীড়িত ব্যক্তির তালিকায় রাখা উচিত।"

বন্দীদের মধ্যে যতীন দাস যেন মরবার জন্য কৃতসংকল্প। ২রা অগস্ট ডক্টর গোপীচাঁদ ভার্গব যতীন্দ্রনাথের সংগে দেখা করলেন। তাঁর সংগে

যতীনের যে কথা হয় তা ডেপুটি সুপার খৈরুদ্দিন লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

গোপীচাঁদ—সুপ্রভাত মি. দাস।

যতীন দাস—সুপ্রভাত।

গোপীচাঁদ—আপনি ওষুধ খাচ্ছেন না, এমনকি জল পর্যন্ত গ্রহণ করছেন না। কেন বলুন ত' ?

যতীন দাস—আমি মরতে চাই।

গোপীচাঁদ—কেন ?

যতীন দাস—আমার দেশের জন্য। রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই।

৩ তারিখে জয়েণ্ট সেক্রেটারি ইমার্সনের কাছে রিপোর্ট গেল—দাসের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ভগৎ সিংকে রাজি করানো গেছে যাতে তিনি দাসকে ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন। তিনি সে চেষ্টা করেছেন।

৫ই অগস্টের খবর—শুকদেব অনশন ভঙ্গ করেছে। কিন্তু দাসের অবস্থা অবনতির দিকে চলেছে।

৭ই অগস্টের খবর—দাসের অবস্থা গতকালের তুলনায় আরও খারাপ। তার শরীরে ঝিমুনি দেখা দিয়েছে। ডাক্তার ভার্গবের চেষ্টায় দাস সাদা জল মাত্র পান করেছে। গায়ের তাপ ১০০°, নাড়ির গতি ৭২ (মিনিটে)।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পাকলে অগস্ট মাসের ৭ তারিখে রিপোর্ট দিলেন —"সাইমন কমিশন গঠনের সময় থেকে রাজনৈতিক মহল চেষ্টা করে চলেছে যাতে গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। এই মুহূর্তে তারা সাফল্যের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। একটি নীতিকে সামনে রেখে তেরোজন যুবকের আমৃত্যু অনশন সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করছে। দেশের প্রত্যেকটি মহলেই এদের জন্য সহানুভূতি দেখা দিয়েছে। যদি এদের মধ্যে দু'একটির মৃত্যু ঘটে তা হলে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে।...

"যে সকল লোক ডাকাতি, হত্যা ও বোমা তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত গভর্নমেণ্ট তাদের কিছুতেই সাধারণ অপরাধীদের থেকে আলাদা করে দেখতে পারে না। কিন্তু যারা অন্য অপরাধে বা ষড়যন্ত্রের জন্য বন্দী হয়েছে, তাদের শ্রেণীবিভাগ বা অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনার জন্য গভর্নমেণ্ট ইচ্ছুক হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করতে

পারে যাতে আইনসভার একজন সরকারী ও দু'জন বেসরকারী সভ্যকে মনোনীত করা যেতে পারে।

"আমি মনে করি, অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় আমার বিশ্বাস, আমি যা বলেছি তার ফল ভালো হবে। তবে দাসের মৃত্যুর আগেই এই কমিটি গঠন করা দরকার।"

জে এ ফার্গুসন গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে পাকলের রিপোর্ট পাঠিয়ে লিখলেন,—

"দাস গুরুতর অসুস্থ, কাজেই অবিলম্বে এ'ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। অনশন ধর্মঘট চারদিকে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, পাকলের প্রস্তাবিত কমিটি গঠনের আগেই যদি বন্দীদের কারও মৃত্যু ঘটে, তবে আমাদের গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

"আমি তাই মনে করি যে, অবিলম্বে অনুরূপ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া দরকার।"

লালা দুনিচাঁদ একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন,

"স্বরাষ্ট্র সচিব সি এম জি অগিলভিউ-এর সংগে আমি এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম। যে কথাটা আমি খুব জোর দিয়ে বলতে চেয়েছি তা হল এই যে, সরকার পক্ষ থেকে অন্ততঃ একটি ঘোষণা প্রচার করা উচিত। ঘোষণায় বলা হবে যে, অন্ততঃ ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বন্দীদের শ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারে সাধারণ কয়েদীদের থেকে পৃথক ভাবেই দেখা হবে। আমি চেষ্টা করবো যাতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা অনশন ত্যাগ করেন। যদিও আমি সরকারী মনোভাব বুঝতে পেরেছি বলেই মনে করি, তবুও সরকার পক্ষ থেকে কেউই এ ধরনের কোন ঘোষণা করতে রাজি হলেন না। বন্দীদের যে যন্ত্রণা ও অত্যাচারের মধ্যে থাকতে হচ্ছে যদি তার কিছু লাঘব করতে পারি এই আশায় আমি সাহস করে আদালতে তাদের সংগে দেখা করলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও আমাকে বন্দীদের সংগে কথা বলবার অনুমতি দিলেন। ভগৎ সিং আমায় বোর্স্টাল জেলে তিনজন বন্দীর সংগে দেখা করতে বললেন। তাদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। তাঁরা হলেন, দাস, ঘোষ এবং শিব বর্মা।

আলোচনার সময় আমি দেখলাম যে, ভগৎ সিং ও অন্য অভিযুক্তরা মনের দিক থেকে সবল এবং তাঁদের আলোচনা যুক্তিপূর্ণ। আমার ধারণা হল যে, নীচের শর্তগুলি পালন করলে তাঁরা অনশন ভংগ করবেন—

১. যারা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ও ৩৯৬ ধারায় অভিযুক্ত তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, আলোচ্য দাবির পরিধি থেকে তারা বাদ পড়বেন। কিন্তু অন্য সকলেই যাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ, তাঁদের এই দাবির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. রাজনৈতিক বন্দীদের খুব ভাল খাবার দিতে হবে, এ দাবি তাঁরা করেন নি। কিন্তু তাঁরা চেয়েছেন যে, তাঁদের দেয় খাদ্য মোটামুটি ভদ্র এবং উপযুক্ত হওয়া চাই।

৩. তাঁদের অন্ততঃ কিছু সংবাদপত্র ও বই পড়তে দিতে হবে।

৪ যে ধরনের শারীরিক পরিশ্রমে তাঁরা একেবারেই অভ্যস্ত নন, সে ধরনের কাজ তাঁদের দেওয়া চলবে না।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের দাবিগুলিকে স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা না হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা অনশন ত্যাগ করবেন না।"

পাঞ্জাবের গভর্নর ইমার্সনকে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়ে লিখলেন—

আইন সভার সদস্য ডক্টর গোপীচাঁদ ভার্গব অভিযুক্তদের সংগে দেখা করেছিলেন। তিনি মনে করেন, যতীন্দ্রনাথ দাসের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।···

ভগৎ সিং'এর সংগে প্রায়ই তাঁর বাবা দেখা করেন। কিন্তু ভগৎ সিং-এর ওপর তাঁর বাবার কোন প্রভাব আছে বলে মনে হচ্ছে না। অন্ততঃ তিনি তাঁর পুত্রকে অনশন ত্যাগে রাজী করাতে পারেন, এমন ধারণা সত্য নয়।···

বটুকেশ্বর দত্তকে তাঁর বোন দেখাতে আসেন; বাংলা থেকে তাঁর আত্মীয়স্বজন চিঠি লেখেন। কিন্তু দত্ত অনশনে ত্যাগে রাজী হবেন এমন কোন ইংগিত নেই।

··যতীন্দ্রনাথ দাসের ভাই জেলের মধ্যে দিনরাত তাঁর দাদার কাছে রয়েছেন। দাসকে ওষুধ ও উত্তেজক কিছু খাওয়াবার চেষ্টা তিনিও করছেন। কিন্তু দাস অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় আছেন। তাঁর মনের ভাব পরিবর্তনের কোন লক্ষণ নেই।

ডাক্তার ভার্গব বলেন যে, কিছু সুখাদ্য দিলে বা বন্দীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিলে কোন লাভ হবে না। কারণ তাঁরা ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁরা চান সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘোষণা।

(ফাইল নং ২৪২, পলিটিক্যাল, হোম)

ইতিমধ্যে 'প্রতাপ' পত্রিকার সম্পাদক গণেশশংকর বিদ্যার্থী একটি বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতির আলোচনা করেন। তিনি ভগৎ সিং'এর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে,

"ভগৎ সিং'কে জেলে কনডেমড সেলে একা রাখা হয়েছে। আমাকে তিনি বলেছেন যে, তাঁরা রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে সরকারের ব্যবহার পরিবর্তনের জন্যই অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছেন। সরকার তাঁদের নড়াচড়ার স্বাধীনতা পর্যন্ত বন্ধ করে কুৎসিৎ অপরাধে দোষী অপরাধীদের সংগে একই পর্যায়ে রেখেছে। নোংরা খাদ্য পরিবেষণ করে, কোন বই বা কাগজ পড়তে না দিয়ে এবং নির্জন সেলে রুদ্ধ করে রেখে সরকার তাঁদের মানসিক ও শারীরিক মৃত্যু একত্রে ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছে।

অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগেই ভগৎ সিং বলেছেন যে, আমাদের সাহস যখন আছে, তখন সম্মান রক্ষার জন্য এবং নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা মৃত্যু বরণ করতে চাই।"

যতীন দাসের প্রসংগে বিদ্যার্থী বললেন—

"আমি শুনলাম যে, জোর করে তার নাকে ও মুখে দু'দিকে দু'টি পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এক সংগে দু'টি পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়ায় প্রচুর রক্তপাত হয় এবং দাস অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে দেখলাম প্রায় অজ্ঞান। কথা বলবার শক্তি নেই বললেই চলে।"

যতীন দাসের অবস্থা উদ্বেগজনক হওয়ার জন্যই তাঁর ছোট ভাই কিরণ-চন্দ্রকে জেলের মধ্যে তাঁর সেবার জন্য থাকতে দেওয়া হয়।

১১ই অগস্টের 'লিবার্টি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হল—The spirit of freedom must be kept alive at any cost if the nation is to live again, and these youngmen offer their own bodies as fuel that the sacred fire may be kept burning from generation to generation.

॥ একুশ ॥

অবশেষে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট 'জেল এনকোয়ারি কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ১৬ই অগস্ট ১৯২৯ সেই ঘোষণা সকলকে জানানো হল। কমিটির প্রধান হলেন পাঞ্জাবের জেল-বিভাগের আই. জি.। কমিটিতে সদস্য হিসাবে নেওয়া হল আফজল হক্, মোহনলাল, হরবক্স সিং, মহীন্দর সিং, দৌলতরাম মালিয়া, চৌধুরী জাফরউল্লা, মহম্মদ হায়াৎ খাঁ, এবং কুরেশী আলিকে। (লালা দুনিচাঁদের নাম তখনও ঘোষিত হয়নি)। কমিটির সেক্রেটারি করা হল, অগিলভিকে।

ইতিমধ্যে কয়েকজন অনশনব্রতীর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। কেউ কেউ মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে পড়লেন। যতীন দাসের অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়লো যে, কলকাতায় তাঁর বাবা বঙ্কিমবিহারী দাসকে জানানো হল। কমলনাথ তেওয়ারী, শিব বর্মা ও জয়দেব কাপুর বুকে ও পাকস্থলিতে প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করছেন। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন ডাক্তার গয়াপ্রসাদ ও অজয় ঘোষও।

১৬ই অগস্ট উত্তর প্রদেশ সরকারও প্রদেশের জেল এনকোয়ারি কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশ করলেন। স্যর লুই স্টুয়ার্ট, পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ ও হিদায়েতুল্লাকে নিয়ে গঠিত এই কমিটির সুপারিশগুলি মোটামুটি ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগী বন্ধুদের দাবির অনুকুল। কমিটির সদস্যরা সমবেত ভাবে যে অনুমোদনগুলিতে স্বাক্ষর দিলেন, তার মধ্যে রইল—

হাতকড়া দেওয়ার রীতিকে যতদূর সম্ভব বর্জন করতে হবে।

কোর্টে বন্দীদের ভ্যানে করে নিয়ে যেতে হবে।

বন্দীদের তালাবদ্ধ সেলে রাখার প্রথাকে সম্ভবমত কমিয়ে দিতে হবে।

বিচারাধীন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের স্বতন্ত্রভাবে রাখতে হবে এবং যারা নৈতিক দুষ্টতায় দোষী নয় তাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র শ্রেণীর কথা ভাবতে হবে।

অজস্র অনুরোধ আসতে লাগলো ভগৎ সিং, যতীন দাস ও অন্যান্যদের কাছে। সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো। তারা চাইলো, এই তরুণদের প্রাণরক্ষা হোক।

তবুও অনশনব্রতী বন্দীরা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চললো। যতীন দাসের অবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮ই তারিখে দাসের শরীরের তাপ

অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ালো। তিনি প্রচণ্ড বমি শুরু করলেন। তাঁর অজ্ঞাতে জলের সঙ্গে সামান্য গ্লুকোজ মিশিয়ে দেওয়া হল।

১৯ ও ২০ তারিখ এইভাবেই গেল। ২১ তারিখে ভগৎ সিং এসে দেখা করলেন দাসের সঙ্গে। ভগৎ সিং এসে কাতর অনুরোধ জানালেন একটু দুধ খাওয়ার জন্যে। কিন্তু দাস অটল। নিরুপায় হয়ে ভগৎ গোপীচাঁদ ভার্গবকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি দাসকে একটু বলেন। ভার্গব ও পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন এলেন দাসের কাছে। তাঁদের সঙ্গে ভগৎ এবং বটুকেশ্বর।

তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়, তা বোর্স্টাল জেলের সুপার লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

টণ্ডন এসে বললেন প্রথমে—মি. দাস, কেমন আছেন আজ ?

অর্ধঅচেতন অবস্থাতেই দাস উত্তর দিলেন—খুব ভালো।

টণ্ডন বললেন—আপনার যে বাঁচা দরকার, মানে আরও কয়েকদিন অন্ততঃ।

দাস উত্তর দিলেন—আমি বেঁচে আছি।

—কিন্তু ওষুধ বা পুষ্টিকর কিছুই না খেয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবেন ?

দাস—আমার ইচ্ছার জোরে।

গোপীচাঁদ ভার্গব এবারে বললেন—একটু ওষুধ অন্ততঃ খান মি দাস। আরও পনরোটা দিন অন্ততঃ দেখুন, যদি আপনাদের দাবি পূর্ণ না হয় তাহলে আর আমরা বলবো না আপনাকে ওষুধ খেতে।

দাস মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে করে বললেন—এই সরকারকে আমি বিশ্বাস করি না। এখন আর আমার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। আমার ইচ্ছাশক্তির জোরেই আমি আরও কয়েকদিন বেঁচে থাকবো।

এরপর ভগৎ সিং তাঁকে অনুরোধ জানাতে এলে দাস উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বলেন—তুমি কেন এসেছ আবার ? না, তোমার কোন কথা আর আমি শুনতে রাজী নই।

এরপর গোপীচাঁদ ভার্গব বললেন—দুধ না, অন্য কোন পুষ্টিকর খাদ্য না। শুধু কয়েকটা দিন আরও বেঁচে থাকবার জন্য দাসের এনেমা (Enema) জাতীয় ওষুধ খাওয়া দরকার। গোপীচাঁদ কথা দিলেন যে, তিনি নিজের হাতে সে ওষুধ দেবেন। তাঁর কাছে কোন সরকারী ডাক্তার আসবে না।

দাস রাজী হলেন গোপীচাঁদের কথায়।

তবুও ধীরে ধীরে যতীন্দ্রনাথের শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। তার চোখের পাতা নিমীলিত। চোখ খুলে চাইতে পারছেন না। নাড়ির গতি মিনিটে ৫৮। সাদা জল ছাড়া তাঁকে আর কিছুই খাওয়ানো যায় না। ২৮ তারিখে দেখা গেল তার সম্পূর্ণ বাকরোধ হয়েছে। যতীন আর কথা বলতে পারছেন না।

৩০ তারিখে ডাক্তার গোপীচাঁদ ভার্গব, পণ্ডিত শান্তনম্, সর্দার শার্দুল সিং এবং সর্দার কিষণ সিং (ভগৎ সিং-এর পিতা) যতীন্দ্রনাথকে দেখতে এলেন।

গোপীচাঁদ ভার্গব আকুল হয়ে বললেন—আপনি যে আমায় কথা দিয়েছিলেন, একটু একটু ওষুধ অন্ততঃ খাবেন। আপনার কথা রাখলেন না কেন মি. দাস?

দাস নিঃশব্দ হয়ে পড়ে রইলেন। বোঝা গেল না ভার্গবের কথা তিনি শুনেছেন কিনা।

ভার্গব যতীনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন—যতীনবাবু, আমরা জানি মৃত্যু আপনার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমরা চাই আপনি আর কয়েকটা দিন অন্ততঃ বেঁচে থাকুন। আমরা আপনাকে নীতি থেকে পেছিয়ে আসতে বলছি না। আপনার এ অবস্থায় ওষুধ খেয়ে আয়ু বাড়ানো যে আপনার যন্ত্রণাকেই বাড়ানো—তাও আমি জানি। তবু, তবু যতীন বাবু, আরও কয়েকটা দিন মাত্র, আপনাকে জেনে যেতে হবে যে এই দুঃসহ নির্যাতন ভোগের পর জেল কমিটির সুপারিশে কি হল, কি পাওয়া গেল।

পণ্ডিত শান্তনম্ এবং অন্য সহযোগী বন্ধুরা তখন সকলেই ঘিরে রয়েছে যতীনকে। সকলের চোখেই কাতর অনুনয়। ফিসফিস করে তারা বলছে—কথা রাখো দাস, কথা রাখো আমাদের।

অবশেষে যতীন ইঙ্গিতে স্বীকৃতি জানালেন—শুধু একটু ওষুধ: আর কিছু না।

সর্দার কিষণ সিং পাথরের মত নির্বাক হয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে জেল এনকোয়ারি কমিটির সদস্যরা জেলে এলেন এবং বন্দীদের সকলের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা অনুরোধ করলেন অনশন স্থগিত রাখার জন্য। তাঁরা কথা দিলেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের দাবির

প্রত্যেকটিই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করে তাঁদের সুপারিশ দেবেন। তাঁদের আশ্বাসে এবং অনুরোধে অবশেষে সকলে স্থির করলেন, যে, কিছুদিনের জন্যে অনশন স্থগিত রাখা যেতে পারে।

২রা সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা পাঁচটায় ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও অন্যান্য সকলে তাঁদের অনশন ভঙ্গ করলেন।

অটল রইলেন শুধু যতীন্দ্রনাথ। মৃত্যু তখন তাঁর চোখের সামনে এসে তার ছায়া মেলে ধরেছে। মৃত্যুকে আর ভয় কি? শরীরের যন্ত্রণাকে কাটিয়ে উঠেছেন তিনি মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। তাঁর সংকল্প, হয় গভর্নমেণ্ট মেনে নেবে তাঁদের দাবি আর নইলে মৃত্যু।

মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত যতীন্দ্রনাথ দাস। তাঁর শরীর অবশ হয়ে গেছে। অবশ হয়ে গেছে কোমর থেকে নিম্নাঙ্গের সবটুকু। চোখের পাতা আর খোলে না। জিভ আড়ষ্ট। তবু অটুট রয়েছে ইচ্ছাশক্তি।

জেল এনকোয়ারি কমিটির চারজন সদস্য একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন—

"We the undersigned members of the Punjab Jails Enquiry Committee desire to make the following statement as to the circumstances which led to the discontinuance of the hunger-strike of the Lahore Conspiracy case. In deference to our sincere desire and at our earnest request and further in view of the condition of Sj. Jatindranath Das, one of the hunger-strikers, Bhagat Singh and all the others have discontinued from 5.00 p m. today the long drawn hunger-strike···We earnestly expect that in view of the critical condition in which Sj. Jatindranath Das is lying in jail, the Government will be pleased to order his release immediately.

Sd. Lala Dunichand
Mehtab Singh
Abdul Huq
Mohanlal

অর্থাৎ—লালা দুনিচাঁদ, মেহতাব সিং, আবদুল হক ও মোহনলাল একটি স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বললেন—আমাদের একান্ত অনুরোধে ও আমাদের আকাঙ্ক্ষাপূরণের সদিচ্ছায় এবং বন্দীদের একজন শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাসের কঠিন অবস্থার জন্য ভগৎ সিং ও অন্য বন্দীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের অনশন আজ বিকেল পাঁচটায় ভঙ্গ করেছেন। ··

আমরা বিশেষভাবে প্রত্যাশা করি যে, যতীন্দ্রনাথ দাস জেলে যে গুরুতর অবস্থার মধ্যে পড়ে আছেন, তা' বিবেচনা করে সরকার অবিলম্বে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু বিদেশী গভর্নমেণ্টের কাছে মানবিক সহৃদয়তার আশা দুরাশা মাত্র। পাঞ্জাব সরকার যতীন দাসকে মৃত্যুর মুখোমুখী দেখেও নোংরা রাজনীতি শুরু করলো।

যতীন্দ্রনাথের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ভাই কিরণচন্দ্র এবং অন্য বন্দী বন্ধুরা জামিনে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথের অবস্থার আরও অবনতি ঘটলো। প্রচণ্ড জ্বরের সঙ্গে বমি আরম্ভ হল। ভগৎ সিং এবং অন্যান্যরা জানালেন যে, যতীন্দ্রনাথকে মুক্তি না দিলে এবং জেল এনকোয়ারি কমিটির সুপারিশ মেনে না নিলে তাঁরা আবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনশন শুরু করবেন।

পাঞ্জাব সরকার নীরব রইলো। ভগৎ সিং এবং জিতেন সান্যাল, অজয় ঘোষ, কিশোরীলাল, বিজয় সিং ও শিব বর্মা আবার অনশন আরম্ভ করলেন।

১১ তারিখে জানা গেল যে, যতীন্দ্রনাথ নিঃসাড়, সংজ্ঞাহীন। মৃত কি জীবিত বোঝা যায় না।

১২ তারিখে ভগৎ সিং ও অন্যরা আবার অনশন ভঙ্গ করলেন। জেলের সকল বন্দীই তখন সমবেত যতীন্দ্রনাথের শয্যার পাশে। সকলের চোখ ও মন একাগ্র হয়ে চেয়ে রইল। এপারে জীবন, ওপারে মৃত্যু। মাঝখানে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির সেতু। সাধক যেমন সমাধি-মগ্ন হতে পারেন, তেমনি এক সমাধি-নিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন মহাবিপ্লবী তরুণ। কেউ আর ভাবছে না অনশনের কথা, দাবিপূরণের কথা। সমস্ত দাবির শেষ, সব চাহিদার অন্তিমে এসে পৌঁছেছেন তিনি, যে তরুণ অবহেলায় বলেছিলেন, "দেশের জন্যই আমায় মরতে হবে।"

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯। বেলা ১'০৫ মিনিট। সমস্ত জেল এক নিঃশব্দ বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালো। সমগ্র লাহোরের মানুষ রুদ্ধ বেদনায় ভেঙে পড়লো জেলের দরজায়।

যতীন্দ্রনাথ চলে গেলেন।

*　　　*　　　*

দেশের মানুষ পাগল হয়ে গেল বেদনায়। উত্তাল হয়ে উঠলো মানুষ লাহোর, দিল্লী এবং কলকাতায়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবীর নোটিস দিলেন মোতিলাল নেহরু। তিনি বললেন—"সভার অনুমতি নিয়ে আমি এই মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করছি। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীদের প্রতি সরকারী নীতির প্রতিবাদেই এই প্রস্তাব। সরকারী নীতির জন্যই যতীন্দ্রনাথ দাসের জীবনান্ত ঘটেছে এবং অন্যাদের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে।..."

কেন্দ্রীয় সভার সভ্য অমরনাথ দত্ত বললেন—"আমি এই গভর্নমেণ্টকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করছি। যতীন্দ্রনাথকে তাঁরা হত্যা করেছেন।"

সরকারী নীতিকে তীব্র ধিক্কার দিয়ে সেদিন কেন্দ্রীয় আইন সভায় ঝড় তুলেছিলেন অমরনাথ দত্ত, কেলকার, দেওয়ান চমনলাল ও জিন্না। জিন্না তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলেন—"এদেশের যুবশক্তি আজ জেগে উঠেছে। ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক, এ ধরনের ঘটনা এখানে ঘটবেই। পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের এই দেশে, তাদের বিভ্রান্ত বলে যতই গালাগালি করুন, এমন অপরাধের ঘটনাকে নিবারণ করতে এই গভর্নমেণ্ট কিছুতেই পারবে না।"

জেলে অনশনরত অবস্থায় বন্দী যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবী প্রস্তাব তুললে যে বিতর্কের শুরু হয়, তার মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তৃতা নানা ভাবে স্মরণীয়। মালব্যজীর বক্তৃতার অনুবাদ নিচে দেওয়া হল—

[Home Dept. Pol., File No. 21/63 (Pages 14, 15, 16, 17)—1929]

"আমি দুঃখিত যে, আমার বন্ধু মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে আমাকে সরকারী নীতি ও সরকারের কাজের সমালোচনায় যোগ দিতে হচ্ছে। লাহোর জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘটে সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তার ফলে একজন যুবকের মৃত্যু ঘটেছে এবং অন্য কয়েকজনের মৃত্যুর

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমাদের এই সমালোচনায় যে যুক্তি আছে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রসচিব তা বুঝতে অক্ষম হয়েছেন এবং তার জন্যে আমি আরও ব্যথিত বোধ করছি। এমন অনেক উদাহরণ আছে যে, একজন মানুষ তার কাজের বা নিষ্ক্রিয়তার ফলাফল আগে থেকে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু যখন এক মহৎ যুবকের জীবনান্ত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে, তখন, আমাদের ধারণা ছিল, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং অন্যান্য যাঁরা তার জন্য দায়ী, তাঁরা সকলেই অনুতপ্ত বোধ করবেন। তাঁরা যে সঠিক নীতি গ্রহণ করেন নি এবং তার জন্য যে দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে কথা ভেবে অনুতাপ করবেন। লাহোর জেলের বিচারাধীন বন্দীদের জন্য যে সাধারণ মানবিক চেতনা থাকা উচিত সেটুকু বোধও তাঁদের থাকে নি। এই বিচারাধীন বন্দীরা কি ধরনের লোক, সে কথা প্রথমেই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাঁরা সাধারণ অপরাধীদের শ্রেণী নন। হিংসাত্মক কাজের জন্য দোষী করে যতই তাঁদের অপবাদ দেওয়া হোক, কোন স্বার্থকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজই তাঁরা করেন নি। এই বন্দীদের প্রত্যেকটি যুবক স্বদেশপ্রেম ও দেশকে মুক্ত করার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ। এই সামান্য কথাটুকু এই গভর্নমেণ্টের মনে রাখা উচিত বলেই আমি মনে করি। যাঁদের অপরাধী করা হয়েছে তাঁদের চরিত্র ও আদর্শ বিচার করে তাঁদের প্রতি কি ব্যবহার করা উচিত তা' সরকার স্থির করে নেবেন, এইটুকু আশাই আমরা করেছিলাম।

"তাঁরা হিংসাত্মক কোন কাজ করে থাকলে তার জন্য শাস্তি অবশ্যই পাবেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট ও আদালতকে মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা সাধারণ অপরাধী নন। সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত কোন কাজ তাঁরা করেন নি। লাহোর জেলে যাঁদের বিচার শুরু হয়েছে তাঁরা যে উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ একথা মনে রাখা হয় নি। বিচারাধীন বন্দীদের ওপর যে ধরনের ব্যবহার করা হয়, তারই বিরুদ্ধে তাঁদের বিশেষ কিছু অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের এই অভিযোগগুলি তাঁরা যথারীতি কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ করেছেন। আমার কাছে তাদের লেখা কয়েকটি চিঠির অনুলিপি আছে। একটি চিঠিতে ভগৎ সিং পাঞ্জাবের জেল-বিভাগের আই. জি.'কে জানিয়েছেন—

'দিল্লীতে অ্যাসেমব্লি বোমার মামলার আসামী হিসাবে আমি কারাদণ্ডে দণ্ডিত। অতএব আমি নিঃসন্দেহে একজন রাজনৈতিক বন্দী। দিল্লী

জেলে আমি সেই মত ব্যবহারই পেয়েছি। কিন্তু এখানে (লাহোর) আসার পর থেকে আমার সংগে একজন সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আমি ১৫ই জুন সকাল থেকে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেছি। আমি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে যে ব্যবহার আমার প্রাপ্য আমার সংগে সেই ব্যবহার করা হোক। আমার দাবি, আমাকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হোক, দেওয়া হোক প্রয়োজনীয় টয়লেট (তেল, সাবান, দাড়ি কামাবার সামগ্রী ইত্যাদি)। সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কাব্য, উপন্যাস ও সংবাদপত্রাদি পাঠের অধিকার আমার চাই। আমি আশা করি, আপনি উপরিউক্ত দাবি-গুলি সম্বন্ধে সুবিবেচনা করবেন।

'আমি আবার আপনাকে ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই যে, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে প্রাপ্য ব্যবহারই আমরা চাই; কারণ আমরা রাজনৈতিক কারণেই বন্দী।'

"আমি আর একটি চিঠি পাচ্ছি যেটা বি. কে. দত্তর লেখা। এই চিঠিতেও অনুরূপভাবে দাবি করা হয়েছে উপযুক্ত ব্যবহার। ভগৎ সিং এবং দত্তর চিঠিতে ভারতীয় এবং শ্বেতাংগ বন্দীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের যে বৈষম্য আছে তারও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অনেকদিন ধরেই নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়ে থাকে। এই সরকারের হাতে বর্ণবৈষম্যের চরম দৃষ্টান্তও নির্লজ্জ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।"

এরপর মালব্যজী বন্দীদের প্রতি অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক ব্যবহারের উদাহরণ সভার সামনে তুলে ধরেন এবং বলেন—

"এই তরুণদলের ব্যবহার যে কতখানি যুক্তিসংগত এবং ভদ্র তার বিচার আপনারাই করবেন। কিন্তু এঁদের সংগে অত্যন্ত নোংরা ব্যবহার করা হয়েছে। ঘৃণিত চক্রান্ত করে জেল কর্তৃপক্ষ ও পাঞ্জাব সরকার এঁদের উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা শুধুমাত্র উপযুক্ত ব্যবহার চেয়েছিলেন, অন্য কিছুই নয়। অথচ সরকার কী ভাবে তাঁদের পরিচয় দিলেন ?

"মাননীয় স্বরাষ্ট্রসচিব বারবার উল্লেখ করেছেন যে, ভগৎ সিং এবং দত্ত যতীন দাসের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছিলেন। হ্যাঁ, করেছিলেন। কিন্তু কখন ? নিশ্চয়ই অনশন শুরু করার সময় নয়। ভগৎ সিং এবং দত্ত

অনশন শুরুর মুহূর্তে যে দাবিগুলি উপস্থাপিত করেছিলেন সরকার তার প্রতি কোন দৃষ্টি দিয়েছিলেন কি? উপযুক্ত সময়ে সজাগ হলে সেই মর্মান্তিক মুহূর্ত যখন যতীন দাস মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেই মুহূর্তে আসতে হতো না। সরকার তার কর্তব্য পালন করে নি। তাদের নির্বিকার ঔদাসীন্যের দরুন এই মৃত্যু ঘটতে পেরেছে।"

* * *

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আত্মদানের অজস্র উদাহরণ আছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ দাসের এই স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্যে এমন একটা মহনীয়তা ছিল, যা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। একদিকে সমস্ত ভারতবর্ষ বেদনায় উত্তাল। কলকাতায় তাঁর শবদেহ বহন করে যে বিরাট শোভাযাত্রা শ্মশানভূমির দিকে অগ্রসর হয় তার পুরোভাগে থাকেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র তাঁর চিতাভস্ম তুলে নিজের কপালে দিয়ে বলেন, এই বেদনা যেন না ভুলি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষও এই আত্মত্যাগের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য হন। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯ মামলার শুনানি আরম্ভ হলে সরকার পক্ষের কৌঁসুলি কার্ডেন নোয়াড বলেন—

"যতীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ঘটায় আমি আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা অনুভব করছি। মানুষের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ থাকে যা অন্যের প্রশংসা আকর্ষণ করে। বলিষ্ঠতা ও আদর্শের অনুসরণ এমনই একটি সদ্‌গুণ। যে আদর্শের জন্য যতীন্দ্রনাথ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আমরা যদিও তার সমর্থন করি না, তবুও তাঁর অটল ধৈর্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারি না।"

পাঞ্জাব জেলস্ এনকোয়ারি কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন এবং অভিযুক্ত বন্দীদের দাবিগুলি প্রায় পুরোপুরি সমর্থন করলেন। কমিটি আশ্বাস দেওয়ায় ভগৎ সিং ও অন্যরা তাঁদের অনশন ধর্মঘট তুলে নিলেন।

কিন্তু সরকারী মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হল না। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু কিরণচন্দ্র দাসকে সংগে নিয়ে কোর্টে বন্দীদের সংগে দেখা করলেন।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভগৎ সিং তাঁর সহযোগীদের সংগে আরও একবার অনশন করেন। এবার দু'সপ্তাহের জন্য। অবশেষে

, গভর্নমেণ্ট জেলস্ এনকোয়ারি কমিটির অনুমোদনগুলি মোটামুটি মেনে নিলেন। সংগ্রামের একটি পর্যায়ে ভগৎ সিং সফল হলেন।

* * *

মামলার গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতেও এবং তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও মামলা চালানোর এবং তার ফলাফল নির্ধারণের জন্য গভর্নমেণ্ট একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। [Ordinance No III of 1930, on 1st May 1930] এই অর্ডিন্যান্স'এর বলে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুন্যাল'এর হাতে বিচারের ভার দেওয়া হল। প্রথমে এই ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হল যাঁদের নিয়ে তাঁরা হলেন—

১ জাস্টিস জে কোল্ডস্ট্রিম (চেয়ারম্যান)

২. আগা হায়দার, এবং

৩ জি. সি হিলটন।

১২ই মে তারিখে ট্রাইব্যুন্যালের সদস্যদের সঙ্গে বন্দীদের বাদানুবাদ হওয়ায় কোল্ডস্ট্রিম বন্দীদের হাতকড়া পরানোর এবং জোর করে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে ভগৎ সিং এবং তাঁর সহকর্মীরা ট্রাইব্যুন্যাল বর্জন করলেন।

গভর্নমেণ্ট এরপরে ট্রাইব্যুন্যাল পুনর্গঠিত করেন। নতুন সদস্যরা হলেন—

১ জি. সি. হিলটন (Hilton)

২. জে. কে ট্যাপ (Tapp)

৩. আব্দুল কাদির (Quadir)

২১শে জুন নতুন ট্রাইব্যুন্যালের কাজ শুরু হয়। সরকারী উকীল কার্ডন নোয়াড তাঁর অভিযোগ আনেন সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ হল—রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র এবং তারই আনুষঙ্গিক কাজ হত্যা, ডাকাতি, বোমা তৈরী ও বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

অভিযুক্তদের মধ্য থেকে জিতেন সান্যাল ট্রাইব্যুন্যালকে জানালেন যে, বিচারের এই প্রহসনে কোন ভূমিকা নিতে তারা রাজী নন। কাজেই ট্রাইব্যুন্যালের কার্যধারায় তাঁরা অংশ নিচ্ছেন না।

ভগৎ সিং নিরুদ্বেগ উপেক্ষায় ট্রাইব্যুন্যালকে অগ্রাহ্য করে চললেন।

॥ বাইশ ॥

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির সভ্যরা একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভগবতীচরণ ভোরা অন্য সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে কি ভাবে ভগৎ সিং ও অন্যদের মুক্ত করা যায় তারই চেষ্টা করছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৯ তারিখে তাঁরা ভাইসরয়ের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এরপর ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর ও অন্য বন্দীদের জেল লক-আপ থেকে উদ্ধারের জন্য আজাদ ও ভোরা তাঁদের পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হলেন। তাঁরা অনেকগুলি বোমা তৈরী করলেন। তারপর সেই বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য রাভি নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটায় বোমার আঘাতে ভগবতীচরণ ভোরা মারাত্মক আহত হলেন। ২৮শে মে তারিখে নদীতীরে জঙ্গলের মধ্যে এই মহান বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটলো।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির বাংলাদেশের সদস্যরা এক অপূর্ব এবং অভূতপূর্ব ঘটনার সৃষ্টি করলো। বাংলাদেশে আর্মির উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন চট্টগ্রামের সূর্য সেন। আরও ছিলেন যাঁরা, তাঁদের নাম নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন প্রভৃতি।

১৮ই এপ্রিল সূর্য সেন ও লোকনাথ বল'এর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে দখল করলেন। তিনদিন পুরো চট্টগ্রাম শহর ও অস্ত্রাগার তাঁদের দখলে রইলো। জালালাবাদ পাহাড়ে এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে বিপ্লবীরা জয়ী হলেন। কিন্তু তাঁদের নির্ভীক সহকর্মীদের মধ্যে বারোজন এই যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। সূর্য সেন তাঁর সহচরদের নিয়ে ২৩শে এপ্রিল পালাতে বাধ্য হলেন।

২৮শে মে ১৯৩০ প্রাণ হারালেন ভগবতীচরণ ভোরা। কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদ তারপরেও চেষ্টা করেছিলেন ভগৎ সিংকে মুক্ত করতে। বোর্স্টাল

' জেল থেকে ভগৎ ও বটুকেশ্বরকে যখন লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তাঁদের লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন আজাদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর সে পরিকল্পনা সফল হয়নি।

ভগবতীচরণ ভোরা দলকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন নানাভাবে। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির একটি প্রচারপত্র (manifesto) এবং বোমার দর্শন (Philosophy of Bomb) রচনা করেছিলেন তিনি দলের নৈতিক মানকে তুলে ধরবার জন্য। তাঁর পরে দলের পরিচালনা ভার গ্রহণ করলেন আজাদ, যশপাল, কৈলাসপতি, ইন্দর পাল ও হংসরাজ। যশপাল ও ভাগরামই বড়লাটের বিশেষ ট্রেনের তলায় মাইন ফাটিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের জুন মাসে দিল্লী রেলওয়ে একাউণ্টস্‌'এর টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাংক থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা। ৬ই জুলাই দিল্লীর গাডোড়িয়া স্টোরস্‌ থেকে চৌদ্দ হাজার টাকা লুঠ করে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ডাকাতিতে যুক্ত ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, কৈলাসপতি, ধন্বন্তরী, লেখরাম ও কাশীরাম। দিল্লীতেই বোমা তৈরীর জন্য একটি কারখানাও স্থাপন করা হয়। সাবান তৈরীর আড়ালে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু দলের কয়েকজন ধরা পড়ায় এবং কৈলাসপতি তাঁর বিবৃতিতে সমস্ত প্রকাশ করে দেওয়ায় দলের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসে ধন্বন্তরী ধরা পড়েন।

১৯২৯-৩০ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল—[৪৯]

২৩ ডিসেম্বর '২৯—দিল্লীতে বড়লাটের বিশেষ ট্রেনের তলায় মাইন বিস্ফোরণ।

২১ ফেব্রুয়ারি '৩০—বোম্বের জলগাঁওতে বিশ্বাসঘাতক জয়গোপালকে হত্যার চেষ্টা।

২২ ফেব্রুয়ারি '৩০—অমৃতসরে খালসা কলেজে বোমা বিস্ফোরণ।

২/৯ মার্চ '৩০—জলন্ধরে বোমার শেল ও মসলা আবিষ্কার, অমৃতসরে বোমা বিস্ফোরণ।

১৮ এপ্রিল '৩০—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

২৮ মে '৩০—লাহোরে অত্যন্ত বিপজ্জনক বোমার বিস্ফোরণ।

৩১ মে '৩০—কানপুরে বোমার বিস্ফোরণ।

২,৬,১৬,১৯ জুন '৩০—লাহোর, লায়লপুর, ঝাং, রাওয়ালপিণ্ডি, অমৃতসর, গুর্জনওয়ালা, শেখুপুরা প্রভৃতি স্থানে বোমার বিস্ফোরণ।

৬ জুলাই '৩০—দিল্লীর গাডোড়িয়া স্টোরস্ থেকে ১৪০০০ টাকা লুঠ।

২০ ও ২৮ জুলাই '৩০—লাহোরে রাস্তার ধারের এক সরাইয়ে স্যুটকেসের মধ্যে বোমা।

নভেম্বর '৩০—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (২) সূত্রপাত।

২৩ ডিসেম্বর '৩০—লাহোর ইউনিভার্সিটির হলে পাঞ্জাবের গভর্নরকে গুলিবিদ্ধ করেন হরিকিষণ।

তবু ভগৎ সিং নিছক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বারবার বলেছেন যে, বিপ্লবের সংগে জনমানসের যোগ থাকা চাই। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ চেয়েছেন, কারণ মানুষের ওপর মানুষের এতবড় শোষণ ও প্রবঞ্চনার অবসান না ঘটালে মানুষের মুক্তি নেই। যারা শ্রমিক ও কৃষক, সমাজের বুনিয়াদ যাদের ঘাড়ের ওপর ন্যস্ত তাদের অধিকারকে মেনে না নিলে কোন বিপ্লবই অর্থময় নয়, একথাই বলেছেন ভগৎ সিং। রাশিয়ার বিপ্লব প্রচেষ্টা ও সাফল্য তাঁকে মুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেছে। রাশিয়ার কাছ থেকে তিনি রাজনীতির পাঠগ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই সংগে স্মরণীয় যে, ভগৎ সিং এবং যতীন দাসের মত বিপ্লবীরা আত্মদানে জাতীয় মানসকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন।

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা ফেলার প্রসংগে সে কথাই তিনি ঘোষণা করেছেন—It is not the cult of the bomb and pistol. By revolution we mean that the present order of things which is based on manifest injustice, must change.

কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অস্ত্র এবং উপায় স্বরূপ ভগৎ সিং, যতীন দাস বা তাঁদের সহকর্মী বন্ধুরা আত্মদানের মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'এর ম্যানিফেস্টোতে প্রথমেই লেখা হয় (ডিসেম্বর ১৯২৯): The food on which the tender plant of liberty thrives is the blood of the martyrs.

অর্থাৎ—মুক্তির চারাগাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার মূলে শহীদের রক্তসিঞ্চন করতে হয়।

ট্রাইবুন্যালের বিচারে তাঁকে যে চরম দণ্ড দেওয়া হবে, এ কথা ভগৎ

জানতেন এবং তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি যে সব চিঠিপত্র লেখেন তাতে তাঁর মনের দৃঢ়তা এবং বিপ্লবনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ৩.৬. ১৯৩০ জয়দেব গুপ্তকে একটি চিঠিতে তিনি তাঁর নিজের জন্য শার্ট এবং বটুকেশ্বর দত্তর জন্য জুতো কেনার ভার দেন। ১৭ই জুলাই ভগৎ বটুকেশ্বরের বোন প্রমীলা দেবীকে একটি চিঠি লিখে বারাণসী থেকে লাহোর আসতে নিষেধ করেন। ২৪শে জুলাই জয়দেব গুপ্তকে আর একটি চিঠিতে লেখেন—দ্বারকাদাস লাইব্রেরি থেকে আমার নামে এই বইগুলি নিয়ে কুলবীর'এর হাতে পাঠিয়ে দিও—

১. মিলিটারিজম।
২. হোয়াই মেন ফাইট।
৩. সোভিয়েটস অ্যাট ওয়ার্ক।
৪. কোলাপ্স অব সেকেন্ড ইণ্টারন্যাশনাল।
৫. লেফট উইং কমিউনিজম।
৬ মিউচুয়াল এড।
৭. ফিল্ডস ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড ওয়ার্কস্।
৮. সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স।
৯. ল্যান্ড রেভোলিউশন ইন রাশিয়া।

মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি গভীর আগ্রহে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ নির্বাচনের তালিকা থেকে মনে হয়—বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর সংগঠনের দিকেই তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। তাঁর ডায়েরির পৃষ্ঠাতেও এক চিন্তাশীল বিপ্লবী মনের পরিচয় গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। যে চিন্তাধারা তাকে প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা ফাটিয়ে নিজেকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করতে প্রবুদ্ধ করেছিল, সেই চিন্তাধারার গঠন যে কোন পথে এগিয়েছিল তার পরিচয় তাঁর ডায়েরির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। নিচে তার দু'চারটি টুকরো নোট তুলে দিলাম—

Martyrs : The man who clings his whole life into attempt at the cost of his own life to protest against the wrongs of his fellow-men, is a saint compared to the active and passive upholders of cruelty and

injustice, even if his protest destroys other lives besides his own. Let him who is without sin in society cast the first stone at such an one.

Tree of Liberty :

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure. (Thomas Jafferson)

আর এক জায়গায় তিনি নোট করেছেন :

To hesitate is crime.

Hesitation on the part of the leaders and felt by their followers is generally harmful in politics, but in the case of an armed insurrection it is a deadly danger.

War is war ; come what may, there must be no hesitation, no loss of time.

The strength of a revolutionary party grows to a certain point after which the contrary may happen.

*　　　*　　　*

ভগৎ সিং নিজের জন্য কোন আইনজীবী নিয়োগ করতে রাজী ছিলেন না। তবে বন্ধুদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মামলার গতি নির্ধারণের জন্য একজন আইনজীবীকে থাকতে অনুমতি দেন।

সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ট্রাইবুন্যালের বিচারের ধরন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, তাঁর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। তাঁর পিতা কিষণ সিং পুত্রকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে একটি আবেদন করে জানালেন যে, তাঁকে প্রমাণ করতে দেওয়া হোক, ভগৎ নির্দোষ। ভগৎ'এর কাছে এ' খবর পৌঁছোতে তিনি গর্জন করে উঠলেন। একটি চিঠিতে বাবাকে লিখলেন—

—"আমাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তুমি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের সদস্যদের কাছে আবেদন জানিয়েছো, একথা জেনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। এই

সংবাদে আমার মনে যে আঘাত পড়েছে তার ফলে আমি সামঞ্জস্যবোধও হারিয়ে ফেলেছি। আমি জানি পিতৃস্নেহের বশেই তুমি একাজ করেছ; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে না জানিয়ে এমন একটি কাজে হাত দেওয়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে।

"তোমার মনে থাকা উচিত, আমি প্রথম থেকেই তোমায় বলে আসছি যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অভিপ্রায় আমার নেই।

"তুমি জানো যে, এই বিচারের ব্যাপারে আমরা একটি বিশেষ নীতির অনুসরণ করে চলেছি। আমার প্রত্যেকটি কাজ সেই নীতি ও কার্যসূচীর অনুযায়ী হওয়া দরকার। আমাদের বিরুদ্ধে যত গুরুতর অভিযোগই থাকুক, আমরা বিচারের ধারাকে উপেক্ষা করে চলতে চাচ্ছি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরই এই নীতি থাকা উচিত যে, আদালতের শাস্তি যত কঠোরই হোক নির্দ্বিধায় তা মেনে নিতে হবে। অবশ্য নীতির প্রশ্নে আমরা নিশ্চয়ই লড়াই করবো, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রশ্নে নয়।"

দীর্ঘ পত্রে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুললেন ভগৎ। তারপর সবশেষে লিখলেন,—"আমি চাই বাইরের সকল মানুষই আমাদের উদ্দেশ্য জানুক। তাই এ' চিঠি কোনো পত্রিকায় ছাপতে দিয়ো।"

বলা বাহুল্য ভগৎ সিং-এর এ চিঠি ছাপা হয়েছিল 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকার ৪ঠা অক্টোবর সংখ্যায়।

ভগৎ সিং-এর এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, তিনি মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছেন। কোন বিপ্লবীই তাঁর অপরাধ (?) স্খালন করবার চেষ্টা করেন না। দেশকে মুক্ত করবার বা এই উদ্দেশ্যে মানুষকে সচেতন করবার জন্য তিনি যা' করেছেন, তার বিচার এক বিদেশী শাসনতন্ত্র করবে, এ চিন্তা তাঁর অসহ্য। তাই বিচারের এই ছলনার প্রতি তাঁদের সকলের অসীম ঔদাসীন্য।

ভগৎ সিং তখন ভাবছেন তাঁর পূর্বসূরী কর্তার সিং সরোবার কথা—দেশের জন্য মরতে পারলে আমি এই দেশে হাজারবার জন্ম নিতে রাজী আছি।

॥ তেইশ ॥

১৯৩০ সালের ভারতবর্ষ একদিকে আইনঅমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ৬ই এপ্রিল শুরু হয় লবণ সত্যাগ্রহ। ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। বিদ্রোহ দমনে সরকারও পাশবিক হয়ে উঠলো। আলিপুর জেলে লাঠি চললো সুভাষ-চন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ওপর। মেদিনীপুরের ঘাটালে মহকুমা-শাসক ফজলুল করিমের নির্দেশে পুলিস নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে চোদ্দজন লোক প্রাণ হারায়। ঢাকাতে বিনয় বসুর গুলিতে প্রাণ হারালো পুলিস আই. জি. লোম্যান। কিন্তু কলকাতার বুকে ডালহাউসি স্কোয়ারে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করে তিনজন যুবক[৫০] যে ঘটনার অবতারণা করেন ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। তিনজনে ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে সোজা রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় উঠে গেলেন। তারপর তাঁরা গুলি করে মারলেন আই. জি. অব্ প্রিজনস্ সিম্পসনকে। গুলি করলেন ইতস্ততঃ আরও কয়েক ইংরেজ অফিসারকে।

পলকের মধ্যে পুলিস বাহিনী নিয়ে টেগার্ট পৌঁছে গেল। তাদের সঙ্গে চললো সেই তিন যুবকের লড়াই। শেষ পর্যন্ত রিভলভারের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁরা মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে দীনেশ গুপ্ত হাসপাতালে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

পাঞ্জাবও নীরব ছিল না। পেশোয়ারে আবদুল গফ্ফার খাঁর গ্রেপ্তারের পর বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। পাঞ্জাবের গভর্নরের ওপর গুলি চালান বাইশ বছরের যুবক হরকিষণ। বিচারে তাঁকে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং ও অন্যদের বিচারের রায় জানানো হল ৭ই অক্টোবর তারিখে। ট্রাইবুন্যাল সাক্ষ্যপ্রমাণাদিতে যা পেলেন এবং ভগৎ সিং প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রমাণ করা হল, তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

রাজসাক্ষী হিসাবে জয়গোপাল ও হংসরাজ ভোরার স্বীকৃতি এই মামলার প্রধান সাক্ষ্য। হংসরাজ ভোরার কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে, স্যাণ্ডার্স হত্যার পর লাহোরে যে সব পোস্টার ছড়ানো হয় সেগুলি ভগৎ সিং-এর লেখা। ওই সব পোস্টারে ভগৎ সিংহ 'বলরাজ' ছদ্মনামে সই করেন।

তবে ভগৎ সিং-এর কাছ থেকে যে পিস্তল পাওয়া গিয়েছে, সেটাই স্যাণ্ডার্স হত্যায় ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু শুকদেবের কাছ থেকে যে পিস্তল পাওয়া গিয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে স্যান্ডার্সের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। ভগৎ সিং-এর পিস্তল সমেত মোট পাঁচটি পিস্তল ও কুড়িটি বোমা ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

(Report of D. Patrick, dt. 25.5.29., File No. 192/29 Home Pol)

ভগৎ সিংকে হত্যা করতে দেখা গেছে,
তাঁকে এবং অন্যদের সনাক্ত করা হয়েছে।
মৃত্যু সম্পর্কিত পোস্টার যে ভগৎ সিং-এর হাতে লেখা তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ এবং ৩০২ ধারায় ভগৎ সিংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রায়ে বলা হয়—

Having regard to the deliberate and cowardly murder in which he took part and to his position as a leading member of the conspiracy, he is sentenced to be hanged by the neck till he is dead.

শুকদেব ও রাজগুরুরও মৃত্যুদণ্ড হয়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল যাঁদের তাঁদের নাম ঃ

বিজয়কুমার সিংহ, শিব বর্মা, কিশোরীলাল, গয়াপ্রসাদ, জয়দেব কাপুর, মহাবীর সিং এবং কমলনাথ তেওয়ারি। কুন্দনলালকে সাতবছর এবং প্রেমদত্তকে পাঁচবছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হল। মুক্তি পেলেন অজয় ঘোষ, জিতেন সান্যাল ও দেওরাজ।

আদালতে ভগৎ সিং বা তাঁর বন্ধুরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিজেই এলেন রায়ের ফল বন্দীদের জানাতে। ভগৎ সিং-কে তিনি বললেন—আমি দুঃখিত হচ্ছি আপনাকে জানাতে যে, আপনার ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

ভগৎ সিং সহাস্যে বললেন—দুঃখের কি আছে? কবীর বলেছেন—

জিস্ মরণে তে জগ ডরে
মেরে মন আনন্দ।

মরণে তে হি পায়ে
পূরণ পরমানন্দ ॥
অর্থাৎ—যে মরণে জগৎ ডরে,
আমায় যে তা' দেয় আনন্দ।
মরণ শুধু পূর্ণ করে
হৃদয় ; জাগে পরমানন্দ ॥

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে ছিলেন সরকারী উকীল। তিনি বললেন—আপনি একটা আবেদন করে দয়া ভিক্ষা করুন (Mercy Petition)।

ভগৎ হাসলেন—কোন দরকার নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আমরা ন্যায় প্রত্যাশা করি না। শত্রুর কাছে ভিক্ষা পাওয়ার চেয়ে মৃত্যু হাজার গুণে ভালো। আমি যে মুক্তির দীপশিখা জ্বালাবার ভার পেয়েছি!

ভগৎ আবৃত্তি করলেন—
জিনহান দেশ সেবা কি প্যার পায়া
উনহান লাখ্ মুসিবতান ঝলিয়ান নে।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এমন একটি প্রাণকে স্মরণে রেখেই লিখেছেন :
পথে পথে গুপ্ত সর্প, গূঢ় ফণা
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা ;
মৃত্যু দিবে জয়শঙ্খনাদ··· ·····

*　　*　　*

ভগবতীচরণ ভোরার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ ও বটুকেশ্বরকে উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতা প্রবলভাবে আঘাত করেছিল চন্দ্রশেখর আজাদকে।

দলের বিশিষ্ট সদস্য যশপাল কোন ব্যাপারে দলের নীতিবহির্ভূত কাজ করায় সকলেই তার ওপর বিরক্ত হন। কানপুরে যশপালের আচরণ সকলের কাছেই সন্দেহজনক বলে মনে হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এক বৈঠকে সুখদেবরাজ, ধন্বন্তরী, যশপাল ও আজাদ মিলিত হন। আজাদ বীরভদ্র তেওয়ারী নামের এক কনস্টেবলের সঙ্গে যশপালের যোগাযোগের উল্লেখ করে তাকে তিরস্কার করেন। যশপাল নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে আজাদ তাকে ক্ষমা করেন।[৫২]

এর মাত্র দু'মাস কুড়িদিন পরে আজাদ এলাহাবাদে আসেন। আলফ্রেড পার্কে ২৭শে ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি সুখদেবরাজের সংগে কিছু আলোচনা শুরু করেন। সুখদেবরাজের রচনা থেকে জানা যায় যে, এইসময় তিনি লক্ষ্য করেন—পার্কের সামনে থর্নহিল রোডে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। সুখদেবরাজকে তখনই আজাদ বলেন—ওই দেখুন, বীরভদ্র যাচ্ছে।[৫২]

সুখদেবরাজ লিখেছেন—"আমি বীরভদ্রকে চিনতাম না; শুধু নাম শুনেছিলাম। তার হঠাৎ এ সময়ে এখানে আসার কথা নয়। অথচ সাইকেলে ঠিক সামনের রাস্তা দিয়ে সে চলে গেল। আর তার পেছনে পেছনে একটি মোটর ভ্যান এসে পার্কের সামনে দাঁড়ালো। মোটর থেকে নেমে এলো এক ইংরেজ অফিসার আর দু'জন কনস্টেবল।

"ইংরেজ অফিসারটি পিস্তল তুলে জিজ্ঞাসা করলো—তোমরা এখানে কি করছো?"

ইতিমধ্যে গোটা পার্কটাই সশস্ত্র পুলিসে ঘিরে ফেলেছে। গুলাব সিং তাঁর 'আণ্ডার দি শ্যাডো অব গ্যালোজ' গ্রন্থে লিখেছেন—বীরভদ্র তেওয়ারীই আলফ্রেড পার্কে আজাদের উপস্থিতির কথা পুলিসকে জানিয়ে দেয়।

অথচ বীরভদ্র তেওয়ারীর পক্ষে একথা জানবার কোন সুযোগই ছিল না। আজাদ যে এলাহাবাদে আসবেন এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারি সকালে আলফ্রেড পার্কে এক আলোচনায় বসবেন এ'কথা জানতেন সুখদেবরাজ, ধন্বন্তরী ও যশপাল।

আজাদ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পলকে উঠে দাঁড়ালেন। সুখদেবরাজকে ইংগিত করলেন পালিয়ে যেতে। তারপর দুইহাতে দু'টি পিস্তল ধরে পুলিসের মুখোমুখী হলেন।

শুরু হলো দু'দিক থেকেই গুলিবর্ষণ। আজাদের গুলিতে ইংরেজ অফিসার লুটিয়ে পড়লো। ইনস্পেক্টর বিশেশ্বর সিং আহত হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আজাদ একা। চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে বিঁধলো তাঁর গায়ে। লুটিয়ে পড়বার আগে আজাদ নিজের পিস্তল ঘুরিয়ে তাঁর বুকে গুলি করলেন। যেন জীবিত আজাদকে পুলিস না পায়।

হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ এইভাবেই বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে আরেকবার কলংকের দাগ পড়লো। আজাদকে মরতে হলো বিশ্বাসঘাতকতার ফলে।

॥ চব্বিশ ॥

ইতিমধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ভারতসরকার ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। ১৯৩০'এর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার পরই অন্যান্য নেতার সংগে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন (৫ই মে ১৯৩০)। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা গ্রহণ করলেন না। তাঁরা ব্রিটিশ সরকার ও ভারতের মধ্যে একটি গোলটেবিল বৈঠক বসাবার চেষ্টায় ব্যস্ত হলেন। বড়লাট আরউইন'এর অনুরোধে গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে বসবার জন্য আগ্রহী হলেন। ১৯৩১ সালের ২৫শে জানুয়ারি তাঁকে এবং আরও কয়েকজন দক্ষিণপন্থী নেতাকে জেলমুক্ত করা হলে গান্ধী বললেন—I am hungering for peace.

দুর্ভাগ্যক্রমে এইসময়ে মোতিলাল নেহরুর মৃত্যু হওয়ায় গান্ধীজী নিরংকুশ ক্ষমতা নিয়ে আরউইনের সংগে আলোচনায় বসলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির যে খসড়া প্রকাশিত হল তা কংগ্রেসেও কারও মনঃপূত হল না। সুভাষচন্দ্র তখনও জেলে। কাজেই গান্ধীজীর কাজের প্রতিবাদ করবার মত জোর আর কারও ছিল না।

সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন ৮ই মার্চ। তখন গান্ধীজী আরউইন তথা ভারতসরকারের সংগে চুক্তি করতে সম্মত হয়েছেন। এই চুক্তিপত্রে যে শর্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছিল তা হলো—

কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেবে এবং আগামী গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেবে। বিনিময়ে সরকার সকল অহিংস রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হলেন, এমন কি সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের বিনাশুল্কে লবণ তৈরির অধিকার দিতেও রাজী হলেন।

সুভাষচন্দ্র বোম্বে ছুটে গেলেন গান্ধীজীর মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টায়। বোম্বে থেকে যখন তিনি দিল্লী আসছেন গান্ধীর সংগে তখনই সেই সংবাদ পৌঁছলো তাঁর কাছে—ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের শীগ্গিরই ফাঁসিতে ঝোলানো হবে বলে সরকার স্থির করেছে। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে লিখেছেন—

"দিল্লী পৌঁছোতে না পৌঁছোতে আমরা সেই মর্মান্তিক সংবাদ পেলাম

যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর দুই সহকর্মীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকারী করতে হবে, এই হল সরকারী সিদ্ধান্ত। আমরা গান্ধীজীর ওপর চাপ দিলাম যাতে তিনি এই দণ্ডাজ্ঞা মকুব করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ জানান। আমি এই দণ্ড মকুব করার ব্যাপারটাকে চুক্তির একটি শর্ত করার জন্যও তাঁকে বলেছিলাম। কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনের মাধ্যমে যারা বন্দী হয়েছেন তাদের ব্যাপারে নিজেকে যুক্ত করতে গান্ধীজী রাজী হলেন না।"

সমস্ত দেশেই বিক্ষোভ দেখা দিল। কংগ্রেস এবং ভারতসরকারের কাছে অগণিত অনুরোধ আসতে লাগলো ভগৎ সিং প্রমুখের ফাঁসি মকুব করার জন্য। কংগ্রেসের বহু নেতা গান্ধীকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু গান্ধী অটল তাঁর সিদ্ধান্তে।

গান্ধীর সংগে আরউইনের আলোচনা হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারি ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি। ইতিমধ্যে সারা দেশে এবং কংগ্রেসের ভেতরেও যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাকে উপেক্ষা করাও শক্ত মনে হল তাঁর। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করলেন যে, এদের ফাঁসির দণ্ড মকুব করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি আবেদন জানালেন বড়লাটের কাছে—

এলাহাবাদ, ১৪. ২. ১৯৩১.

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির দণ্ড মকুব করে তাদের দ্বীপান্তরে পাঠানো আপনার ব্যক্তিগত দয়াপ্রদর্শনের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। আমি কি আবেদন জানাতে পারি যে, আপনি তাদের ফাঁসির দণ্ড মকুব করুন। আমার ব্যক্তিগত মানবিকতার বোধ থেকে আমাদেরই সহকর্মীদের মৃত্যুদণ্ডকে আমি নৈতিক দিক থেকে বিরোধিতা করছি। কিন্তু তা ছাড়াও এই ঘটনা—কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রয়োজনে নয়, দেশের স্বার্থে যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে তাদের প্রতি এই দণ্ড সমস্ত দেশের মানসিকতাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিলে যখন আইনের ধারা লঙ্ঘন করা হবে না, তখন এইটুকু বিবেচনা ভারত ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে সহৃদয়তার বোধকে জাগ্রত করবে।

[Hom/Pol-1931, File No. 4/20/31]

অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করতে যে ডিফেন্স কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল

তার মধ্যে ছিলেন লালা দুনিচাদ, ডা. গোপীচাঁদ ভার্গব প্রমুখ ব্যক্তিরা। ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করবার অনুমতি চেয়ে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করা হল। কিন্তু সে আবেদনও নামঞ্জুর হল।

তখন সমস্ত দেশ তাকিয়ে রইলো গান্ধীজীর দিকে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির ভিত্তিতে গান্ধী যদি কিছু করেন। কিন্তু ৫ই মার্চ গান্ধী চুক্তি সই করলেন। কংগ্রেস এবং দেশকে জানালেন যে, বড়লাট আরউইনকে তিনি অনুরোধ করেছেন, যাতে ফাঁসি মকুব করে দেন।

৩রা মার্চ তাঁর বাড়ি থেকে সকলে এলেন ভগৎ সিংকে দেখতে। এলেন হতভাগ্য পিতা সর্দার কিষণ সিং, মাতাজী বিদ্যাবতী, তাঁর দিদি অমর কাউর, আর ভায়েরা—কুলবীর ও কুলতার। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে মাতাজী ছেলের হাত জোড়ে ধরলেন।

—ভগন ওয়ালা!

নির্ভীক দেশপ্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড এবং তাঁর মায়ের হৃদয়ের রক্তও সেদিন গান্ধীর মনকে অভিভূত করতে পারেনি। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন—

I might have made the commutation a term of the settlement. It could not be made so··

লর্ড আরউইন (পরবর্তী যুগে আর্ল অব হ্যালিফ্যাক্স) তাঁর স্মৃতিকথায় (Fullness of Days) লেখেন—

"·····After we had made our so-called Irwin-Gandhi Pact, he came to see me the next morning and said that he wished to talk about another matter. He was just going off to the meeting of the Congress at Karachi, which he hoped would ratify our agreement, and he wished to appeal for the life of a young man named Bhagat Singh······He was himself opposed to Capital punishment, but that was not now in debate. If the youngman was hanged, said Mr. Gandhi, there was a likelihood that he would become a national Martyr···"

অর্থাৎ—আমাদের তথাকথিত আরউইন-গান্ধী চুক্তি সম্পাদিত হলে

তিনি (গান্ধী) পরের দিন সকালে আমার সংগে দেখা করতে এলেন। বললেন যে, অন্য একটা ব্যাপারে তিনি আমার সংগে কথা বলতে চান। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে করাচী যাচ্ছেন। আশা প্রকাশ করলেন যে, করাচীতে এই চুক্তি অনুমোদিত হবে। এরপর তিনি ভগৎ সিং নামে এক সন্ত্রাসবাদী যুবক, যে সম্প্রতি নানা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, তার প্রাণ ভিক্ষার আবেদনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী। কিন্তু তার জন্যে এ আবেদন নয়। মি. গান্ধী বললেন, যদি এ যুবকের ফাঁসি হয়, তাহলে সে জাতীয় বীরের মর্যাদা পাবে, এমন সম্ভাবনা আছে।

"Mr. Gandhi said that he greatly feared, unless I could do something about it the effect would be to destroy our pact"

অর্থাৎ—গান্ধী বললেন যে, তাঁর ভয় কিছু করা না হলে তার ফলে প্যাক্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমি বললাম—যথাসময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা ছাড়া আমি আর অন্য উপায় দেখছি না।

"Mr. Gandhi thought for a moment and then said —would Your Excelleney see any objection to my saying that I pleaded for the youngman's life ? I said that I saw none"

অর্থাৎ—মি. গান্ধী একমুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন—আমি যুবকটির প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করেছি বলে কি আপনি আপত্তির কিছু দেখতে পাচ্ছেন ? আমি বললাম—কিছুই না।

ফাঁসির দিন ঠিক হয়েছিল ২৪শে মার্চ ১৯৩১, কিন্তু ২৪শে মার্চ করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে বসছে। গান্ধীর অনুরোধে[৫৩] গভর্নমেণ্ট ফাঁসির দিন এগিয়ে ২৩শে মার্চ ঠিক করলেন। কিন্তু ফাঁসির সঠিক দিন সাধারণকে জানানো হলো না। শুধু একটি টেলিগ্রামে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট সেণ্ট্রালকে লিখলেন—Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev will be executed at 7 on the evening of March 23rd. The news will be made known in Lahore on early morning of March 24th.[৫৪]

সরকারীভাবে তাঁদের ফাঁসির দিন ও সময় জানানো হলো ফাঁসির দিনেই (অর্থাৎ ২৩শে মার্চ) বিকেল ৫টার পর। তখন অন্যান্য সব কয়েদী ঘরে ফিরে গিয়েছে। তাই কারও জানার আর সম্ভাবনা নেই।

ভগৎ সিং ও শুকদেব একটি আবেদনই শুধু রেখেছিলেন। গভর্নরের কাছে একটি চিঠিতে তাঁরা বলেছিলেন,—"আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, আমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করেছি। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান, আর আমরাও যুদ্ধবন্দী। যুদ্ধবন্দী হিসাবে আমাদের দাবি, আমাদের গুলি করে হত্যা করা হোক।"

সন্ধ্যা ৭টার একটু আগেই তাঁদের বার করা হল সেল থেকে। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু তিনজনেই সমস্বরে শ্লোগান তুললেন—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জেলের সমস্ত কয়েদী সে চিৎকার শুনলো এবং প্রত্যুত্তরে সাড়া দিল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য অফিসারও এসে পেঁাছোলো। সাতটার সময় তাঁরা এসে দাঁড়ালেন ফাঁসিকাঠের সামনে। উন্নত দেহ, প্রফুল্ল মুখ। মৃত্যু যে অমৃতের পথ! সেই অমৃতপথযাত্রী তিনটি যুবক।

ভারতবর্ষ তখনও জানে না যে, তিনটি যুবকের প্রাণ বলি দেওয়া হল ফাঁসির কাঠে।

বেসরকারী মানুষের মধ্যে জানতেন শুধু মহাত্মাজী।

২৪শে মার্চ সকালে লাহোরের জেলা-শাসক একটি নোটিস জারি করে জানালেন—

গতকাল রাত্রে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসিতে মৃত্যু দেওয়া হয়েছে। তাদের মৃতদেহ জেল থেকে বার করে শতদ্রু নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করে, ভস্মশেষ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বি. এম. কাউল তাঁর "দি আনটোল্ড স্টোরি" গ্রন্থে এই মহান মৃত্যু-বরণের ছবিটি যে ভাবে তুলে ধরেছেন, ঠিক সেই ভাবেই আমি এখানে শেষ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করছি:

"এক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি সংবাদ পেলাম যে, সেইদিনই ভগৎ সিং-কে ফাঁসি দেওয়া হবে। ভগৎ সিং সমগ্র জাতির ধ্যানমূর্তি হয়ে গিয়েছেন। সেই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠলাম, আর

ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম একটা জায়গায় যেখান থেকে সেই জেলখানার প্রাচীর আমার চোখে পড়ে।

"আমি নীরব ও শ্রদ্ধাপ্লুত, সমগ্র জাতির হৃদয়ের বেদনা আমারও হৃদয়ে। আমি সেই প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম যার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন সর্দার ভগৎ সিং মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্য।

"সেই বেদনাজনক দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছেন এমনই একজনের কাছে আমি শুনেছিলাম শেষ সময়ের বর্ণনা। ভগৎ সিং ছাড়াও তাঁর দু'জন সংগী রাজগুরু ও শুকদেবকেও একই সংগে ফাঁসি দেওয়া হল দেশকে ভালোবাসার অপরাধে। যখন ভগৎ সিং'এর পালা এল, তাঁকে একটি মুখোশ দেওয়া হল তাঁর মুখ ঢেকে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু ঘৃণার সংগে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। তারপর মাথা উঁচু করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। ফাসির মঞ্চে চুম্বন দিয়ে বললেন, 'আমি ধন্য—দেশের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ করতে পারছি।' তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে তাঁর বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। সকলে মাথা নিচু করলো লজ্জায়। ভগৎ সিং নিজেই উঠে গেলেন মঞ্চের ওপরে : গলায় পরে নিলেন ফাঁসির দড়ি।"

ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র সেই তিন বীরের মৃতদেহ তাদের আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেয়নি। অতি সাধারণ মানবধর্মটুকুও তারা উপেক্ষা করেছিল; কারণ জনতার রোষ উত্তাল হয়ে উঠবে এই ভয়ে তারা ভীত হয়ে পড়েছিল।

শোনা যায়, সেই তিন বিপ্লবীর মৃতদেহ রাত্রির অন্ধকারেই শতদ্রু নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। দেহের ওপর পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তারপর সেই অর্দ্ধদগ্ধ দেহগুলিকে শতদ্রুর জলে ভাসিয়ে হত্যাকারীরা ফিরে যায়।

পরের দিন সকালে সেই মর্মান্তিক সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। শতদ্রুর কাছাকাছি গ্রামের যে সব লোক এই ঘটনাটির কথা জানতে পেরেছিল তারাই লাহোরে এসে সকলকে সংবাদ দেয়। সংগে সংগে ভগৎ সিং'এর বোন অমর কাউর জয়দেব গুপ্তকে সংগে নিয়ে সেখানে ছুটে গেলেন এবং শতদ্রুর চরা থেকে অস্থিচূর্ণ ও ভস্মশেষ সংগ্রহ করলেন। তাঁদের পেছনে পেছনে হাজার হাজার লোক ছুটে গিয়েছিল। তারা শোভাযাত্রা করে সেই ভস্মশেষ অস্থি নিয়ে ফিরে আসে।

॥ পঁচিশ ॥

নিখিল ভারত কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে যোগদানের জন্য সর্ব-ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ২৪শে মার্চ করাচী এসে পৌঁছোলেন। করাচীতে সেই দুঃসংবাদ সকলকে পলকে মুহ্যমান করে দিল। তারা শুনলেন ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে নির্দয়ভাবে হত্যার কথা।

হয়তো সকলের মনে শেষ পর্যন্ত আশা ছিল যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির পটভূমিকায় ভারতসরকার বিপ্লবী রাজবন্দীদের প্রাণদণ্ড মকুব করবেন। "The conclusion which the Mahatma and everybody else drew from this attitude of the Viceroy, was that the execution would be finally cancelled and there was a jubilation all over the country …"

[সুভাষচন্দ্র বসু—দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল]

অন্ততঃ গান্ধীজী করাচী রওনা হওয়ার মুহূর্তে যে বিবৃতি দিলেন তাতেও এ'কথাই বলেন, বড়লাটকে তিনি অনুরোধ করেছেন যে, ভগৎ সিং ও অন্যদের ফাঁসির দণ্ড যেন মকুব করা হয়। অথচ সেইদিনই (২৩শে মার্চ) ফাঁসি কার্যকর হয়। গান্ধীজী কিন্তু একথা একবারও বলেন নি যে, ফাঁসি মকুব করতে বড়লাট রাজী হন নি। বড়লাটকে তার অনুরোধের মধ্যে যে কোন ঐকান্তিকতা ছিল না একথা আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে। বরং একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গান্ধীজী নিজেও চাননি যে ফাঁসি মকুব হোক। নিচের চিঠি দু'টি থেকে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে।

স্বরাষ্ট্রসচিব ইমার্সন ২০শে মার্চ একটি চিঠি লেখেন গান্ধীকে—

"ভগৎ সিংকে ফাঁসি দেওয়া হলে দেশে উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে আপনার ও আমার মধ্যে গতরাত্রে যে আলোচনা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গেই এই চিঠি লিখছি। চিফ কমিশনার আমাকে জানিয়েছেন, শহরে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে—সুভাষচন্দ্র বসু সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় একটি প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করবেন। এ ব্যাপারে আপনার অসুবিধা আমি বুঝতে পারছি। আপনিও নিশ্চয়ই সরকার পক্ষের কি অসুবিধা তা বুঝতে

পারছেন। এই মুহূর্তে সরকার কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান না। তবে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হলে তাঁরা বাধ্য হবেন। আজকের প্রতিবাদ-সভায় যদি গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হয়, তবে উত্তেজনার সৃষ্টি হবেই। আপনি যদি আমাদের সহায়তা দিতে চান, যদি এই অসুবিধাকর অবস্থা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নির্ধারণ করতে পারেন, তাহ'লে গভর্নমেণ্ট খুশী হবেন।"

এই চিঠির উত্তরে গান্ধী লিখলেন—

"প্রিয় মি. ইমার্সন

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলাম। ধন্যবাদ। যে সভার কথা উল্লেখ করেছেন আপনার চিঠিতে তার খবর আমিও জানি। আমি সম্ভবমত সতর্কতা গ্রহণ করেছি। আশা করছি কোন গোলমাল ঘটবে না। আমি মনে করি, সভায় বাধা দেওয়া বা পুলিস মোতায়েন করা উচিত হবে না। উত্তেজনা নিশ্চয়ই আছে। সভাসমিতির মধ্য দিয়ে সেই উত্তেজনাকে প্রশমিত হতে দেওয়াই ভালো বলে মনে করি।

ভবদীয় এম. কে. গান্ধী"

ইমার্সন তাঁর চিঠিতে যে আলোচনার কথা উল্লেখ করেছেন, আরউইন (পরবর্তীকালে আর্ল অব্ হ্যালিফ্যাক্স) সেই আলোচনার উল্লেখ করে লিখেছেন—

In conclusion he told me that he anticipated no great difficulty at Karachi······As he was leaving he asked if he might mention the case of Bhagat Singh, saying that he had seen in the press the intimation of his execution on March 24th. This was an unfortunate day, as it coincided with the arrival of the New President of the Congress at Karachi and there would be much popular excitement. I told him I had considered the case with most anxious care, but could find no ground on which I could justify to my conscience commuting the sentence. As to the date, I had considered the possibility of postponement till after the Congress, but had deliberately rejected it.

কাজেই একথা পরিষ্কার যে, গান্ধীজী ভগৎ সিং'এর মৃত্যুদণ্ড, এমনকি মৃত্যুর তারিখও মেনে নিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ শান্তির আশায় তিনি বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার গতিকে প্রতিকূল করতে চাননি।

করাচীতে গান্ধী যখন পৌঁছোলেন তখন প্রবল বিক্ষোভে যুবসমাজ উত্তাল। শ্রীকিরণচন্দ্র দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন—"আমি, অজয় ঘোষ, রামকিষণ, ধন্বন্তরী, ইহসান ইলাহি, কুলবীর ও কুলতার রেলস্টেশনে গান্ধীর বিরুদ্ধে কালোপতাকা প্রদর্শন করে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তাতেই যোগ দিলাম।"

কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করা হল বিপ্লবপন্থী যুবকদের আত্মদানের প্রশংসা করে। বলা হল—

"This Congress while disassociating itself from approving of political violence in any shape or form, places on record its admiration of the bravery and sacrifice of late Sardar Bhaght Singh and his comrades Sukdev and Rajguru and mourns with the bereaved families the loss of their lives."

কংগ্রেসের তরুণদল প্রবল বিক্ষোভে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর হস্তক্ষেপেই সেদিন প্রবল অন্তর্বিরোধ থেকে কংগ্রেস রক্ষা পায়। কংগ্রেস বাধ্য হল ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগী বন্ধুদের সাহসের প্রশংসা করে প্রস্তাব গ্রহণ করতে। যদিও ইতিপূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গোপীনাথ সাহার ফাঁসিতে অনুরূপ প্রস্তাব নেওয়ায় গান্ধী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তার বিরোধিতা করেছিলেন।

বম্বের ফ্রী প্রেস জার্নাল মন্তব্য করল—নীতিস্বীকার ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে আজ অভিযুক্ত করতে হবে।

গান্ধী-আরউইন চুক্তিকেও সেদিন দেশের লোক জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা বলেই বর্ণনা করেছিল।

"ভগৎ সিং ভারতবর্ষের নবজাগ্রত যৌবনের প্রতীক। তিনি হত্যার অপরাধে অপরাধী কিনা, একথা কেউ জানতে চায় না ; সাধারণ মানুষের পক্ষে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে নওজোয়ান ভারত সভার তিনি স্রষ্টা। তাঁর এক সহকর্মী বন্ধু যতীন দাস মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শহীদ হয়েছেন ; তিনি

নিজে এবং তাঁর সহকর্মীরা ফাঁসির মঞ্চে নির্ভীক চিত্ত নিয়ে দাঁড়িয়েছেন”— বলেছেন সুভাষচন্দ্র বসু।

গান্ধীজী ভগৎ সিংকে সন্ত্রাসবাদী এবং হিংসাত্মক পথের পথিক বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু এ'র উত্তর ভগৎ সিং নিজেই দিয়েছেন। কনডেমড্ সেল থেকে তরুণ রাজনৈতিক বন্দীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন—

“আমি সন্ত্রাসবাদী নই। এই ব্যাপারে আমাকে ভুল বোঝার সুযোগ রয়েছে। বস্তুতঃ আমি সন্ত্রাসবাদীর মতই কাজ করেছি। তবুও আমি তা' নই। একজন সত্যকার বিপ্লবীর যেমন চিন্তাদর্শ এবং কিছু নির্দিষ্ট কার্যসূচী থাকে, আমারও তেমনি নিজস্ব একটি চিন্তাধারা আছে এবং আমারও সংগ্রামের পরিকল্পিত সূচী আছে।”

[দি পীপল্—মার্চ ২৯, ১৯৩১]

‘বিপ্লব’ বলতে তিনি কি বোঝেন, একথা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন আদালতে তাঁর বিবৃতিতে—

“বিপ্লব বলতে সবসময়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে বোঝায় না ; এর মধ্যে প্রতিহিংসা নামক শব্দেরও কোন স্থান নেই। বিপ্লব মানে বোমা ও পিস্তলের চর্চাও নয়। বিপ্লব অর্থে আমরা বুঝি, প্রবল অন্যায়কে ভিত্তি করে যে সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমান, তার আমূল পরিবর্তন। সময় থাকতে বাঁচানো না গেলে সভ্যতার পুরো প্রাকারটাই একদিন ধসে পড়বে। কাজেই একটা বড় পরিবর্তনের দরকার ; যারা সমাজকে সমাজতান্ত্রিকতার পথে উজ্জীবিত করতে চান, তাঁদেরই কর্তব্য এমন একটি পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা।........বিপ্লবে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। স্বাধীনতায় তার জন্মস্বত্ব ; শ্রমই সমাজের ভিত্তিমূল ; মানুষের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠাই শ্রমজীবী মানুষের পরিণতি।

এই আদর্শ এবং প্রত্যয়ের জন্য আমরা যে কোন নির্যাতন ভোগ করতে প্রস্তুত আছি।”

কাকা অজিত সিং ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী। সারাজীবনই তিনি স্বাধীনতার জন্য নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন। পিতা কিষণ সিং দেশপ্রেমিক এবং অহিংসবাদী। মাতাজীর মধ্যে তিনি পেয়েছেন উদ্দীপ্ত প্রেরণা। অজিত সিং'এর স্ত্রী হরনাম কাউর তাঁকে দিয়েছেন বেদনাবোধ। সুহৃদ ভগবতীচরণ ভোরা ও তাঁর স্ত্রী দুর্গা দেবী একদিকে যেমন

স্বাদেশিকতার প্রেরণা এবং বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছেন তেমনি মহাসাধকের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তিনি জেনেছেন বন্ধু যতীন দাসের কাছে।

দেশের জন্য প্রাণকে ধূপের মত পুড়িয়ে দিতে তিনি জেনেছিলেন, কারণ তার আদর্শ ছিলেন কর্তার সিং সরোবা। 'মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' একথাই তিনি প্রমাণ করে গেলেন। জীবনই অর্ঘ্য দিতে হবে, কেন না জীবনের অর্ঘ্য না পেলে দেশমাতা জাগ্রত হবেন না। তাই চাইলেন না তিনি নিজেকে বাঁচাতে : বিদেশী শাসকের আদালতে আত্মসমর্থনের ঘৃণাকে তিনি পরিহার করলেন : উপেক্ষা করলেন মৃত্যু দেওয়ার জন্য বিচারের ছলনাকে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ছোটভাই কুলতারকে লিখলেন, I am the morning's lamp and am about to be extinguished.

আমি প্রভাতের দীপ, এবার নিভবার সময় এসেছে।

না নিভবার সময় নয়, জ্বলে উঠবার কাল। মৃত্যু তাঁকে যে-জীবন দিয়ে গেল তারই স্পর্শ পেলো পরবর্তী কালের মানুষ। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের আত্মত্যাগের এবং জীবন দানের মূলে কি যতীন দাস ও ভগৎ সিং-এর অমর আত্মার প্রভাব ছিল না? ভগৎ সিং দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। ব্রিটিশ তাঁকে মারতে পারেনি। দেশের মানুষ তাঁকে উপেক্ষা দিয়ে ম্লান করেনি। সর্দার ভগৎ সিং'কে দেশ জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করেছে।

পরিশিষ্ট—১

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন

রাসবিহারী বসুর সহকর্মী এবং বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২০ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। জেলের বাইরে এসেই তিনি বিপ্লব আন্দোলনকে উত্তরপ্রদেশে উজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হলেন। বিপ্লব আন্দোলন নিয়ে লেখা তাঁর বই 'বন্দীজীবন' তরুণ ছাত্রদের কাছে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এল। সন্ত্রাসবাদের আলোকে লেখা এই বই-খানি সেদিন বিপ্লবীদের কাছে মহামূল্যবান হয়ে উঠেছিল। "এই গ্রন্থের লেখক সন্ত্রাসবাদের পথে যেভাবে তরুণদের জেল ও ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে দিয়েছিলেন, সারা ভারতবর্ষে তেমনটা আর কেউ পারেননি।" কথাটা ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের।[৫৫] ১৯২৪ সালে উত্তরপ্রদেশে দলের দায়িত্ব যোগেশ চ্যাটার্জীর হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি বাংলায় এসে আত্মগোপন করলেন।

১৯২৪ সালেই কুখ্যাত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতারা সেই মুহূর্তে কোন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মী কিছু তরুণ যুবক নেতাদের এই মনোভাবকে নিন্দা জানিয়ে নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। শচীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই কিছু প্রচারপত্র লিখে এবং ছাপিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর এই প্রচারপত্রগুলির মধ্যে 'রেভোলিউ-শনারি' ও 'আপীল টু মাই কানট্রিমেন' চারদিকে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। "a four page pamphlet dated the 1st January 1925, issued over the signature of Vijoy Kumar, President, Central Council. The R. P. of India was probably the production of Sachindranath Sanyal..."[৫৬]

এই সময় শচীন্দ্রনাথ দক্ষিণ কলকাতায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে গোপনে বাস করছেন। তাঁর প্রধান সহকর্মী রবীন (ওরফে যতীন দাস)। নরেন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলোচনা করে শচীন্দ্রনাথ

এক সর্বভারতীয় বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন। এই নতুন সংস্থার নাম হল 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন যতীন দাস, রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিসমিল, যোগেশ চ্যাটার্জী, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন, অনন্ত-হরি মিত্র, চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রদর্শিত হয়। ইংরেজীতে রচিত পুস্তিকায় অ্যাসোসিয়েশন'এর উদ্দেশ্য (Object) হিসাবে বলা হয়—

"এই সংঘের উদ্দেশ্য হবে, সুসংগঠিত এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতবর্ষে এক সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা।

"সাধারণ মানুষ যখন তার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবার সুযোগ পাবে, তখনই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এই প্রজাতন্ত্রের স্থায়ী নিয়মতন্ত্র (Constitution) সৃষ্ট হবে।

"এই প্রজাতন্ত্রের মূল নীতি হবে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকারের প্রতিষ্ঠা ; এবং মানুষকে শোষণ করবার জন্যে মানুষ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার অবসান ঘটানো।"

প্রাদেশিক শাখা সংগঠনগুলির কর্মসূচী প্রণয়ন করতে গিয়ে বলা হয়—
"প্রত্যেকটি প্রদেশ সংগঠনে নিম্নে উল্লিখিত বিভাগগুলি থাকবে ঃ

১. প্রচার
২. সভ্য সংগ্রহ
৩. অর্থ সংগ্রহ
৪. অস্ত্র সংগ্রহ
৫. বৈদেশিক যোগাযোগ।"

অন্যত্র বলা হয়—"অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যেককে সশস্ত্র করে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।"

অ্যাসোসিয়েশনের কর্মধারার বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলা হয়—

"শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়তে হবে। বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানায়, রেলওয়ে এবং কয়লাখনিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে এবং তাদের মনের মধ্যে গ্রথিত করে দিতে হবে যে, তাদের জন্যেই 'বিপ্লব' আনতে হবে।

"বাইরের দেশগুলিতে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত করে আনতে হবে।

"বাইরের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করে আনতে হবে; এদেশেও অস্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

"সৈন্যবাহিনীতে সংঘের সদস্যদের ঢুকিয়ে দিতে হবে।"

যতদূর জানা যায়, পুরো নিয়মতন্ত্রটি শচীন্দ্রনাথ সান্যাল রচনা করেন। 'দি রেভোলিউশনারি' নামে যে প্রচারপত্রটি শচীন্দ্রনাথ সারাভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং যে পত্রটি তখনকার তরুণ বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, সেটিও কাকোরি মামলায় প্রদর্শিত হয়। নিম্নে ইংরেজীতেই সেই প্রচারপত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

The Revolutionary.

An Organ of the Revolutionary Party of India.

India—1st January 1925

(Every honest Indian should read the whole of it and circulate it among his freinds).

Manifesto of the Revolutionary Party of India.

"Chaos is necessary to the birth of a new star" and the birth of life is accompanied by agony and pain. India is also taking a new birth and is passing through that inevitable phase, when chaos and agony shall play their destined role, when all calculations shall prove futile. when the wise and the mighty shall be bewildered by the simple and the weak, when great empires shall crumble down and new nations shall arise and surprise humanity with the splendour and glory which shall be'all its own.

This new power, which is shaking the world from its very depths, this new spirit which is working miracles behind the scene, is also manifesting itself in the young blood of India and is taking the shape of a movement which is despised and ignored by the wise

and the learned, and is being described as the wild dreams of a few mad men. The remarkable movement is the revolutionary movement of young India.

This revolutionary movement has unnerved the weak, has inspired the robust and the healthy and has confounded the worldly wise and the learned. This movement can never be crushed just as much as the coming of the spring can never be thwarted It will never die out until it has fulfilled the mission for which it has taken its birth. Tyrants will oppress it, the faithless will taunt it, and the confounded will denounce it ; but thoughts and ideas can never be crushed by the sword, and the noble impulse that takes birth in the very depths of our being can neither be ignored nor thwarted.

This revolutionary movement is the manifestation of the new life that has taken birth in the nation To denounce this life is to denounce one's own understanding.

Twenty years of ruthless repression has not been able do crush it. Scathing denunciation by the renowned public leaders have not been able to arrest its steady growth. The movement stands mightier today than what it was before. The prospects of the revolutionary party were never so bright as they are today. The future is assured.

Let no Indian deny the existence of this revolutionary party in order to denounce the repressive measures of the foreign rulers. The foreigners have no right to rule over India and therefore they must be denounced and driven out, not that they have com-

mitted any particular act of violence or crime. These are the natural consequences of a foreign rule. This foreign rule must be abolished. They have no justification to rule over India except the justification of the sword, and therefore the revolutionary party has taken to the sword. But the sword of the revolutionary party bears ideas at its edge

The immediate object of the revolutionary party in the domain of politics is to establish a Federal Republic of the United States of India by an organised and armed revolution······

The revolutionary party is not national but international in the sense that its ultimate object is to bring harmony in the world by respecting and guaranteeing the diverse interests of the different nations, it aims not at competition but at co-operation between the different nations and states, and in this respect it follows the footsteps of the great Indian Rishis of the glorious past and of Bolshevik Russia in the modern age. Good for humanity is no vain and empty word with the Indian revolutionaries. But the weak, the coward and the powerless can do no good either to themselves or to humanity.

With regard to the communal questions, the revolutionary party contemplates to grant whatever rights the different communities may demand provided they do not clash with the interests of other communities and they lead ultimately to hearty and organic union of the different communities in the near future······

A few words more about terrorism and anarchism.

These two words are playing the most mischievous part in India today. They are being invariably misapplied whenever any reference to the revolutionaries is to be made because it is so very convenient to denounce the revolutionaries under that name. The Indian revolutionaries are neither terrorists nor anarchists. They never aim at spreading anarchy in the land, and therefore they can never properly be called anarchists. Terrorism is never their object and they cannot be called terrarists. They do not believe that terrorism alone can bring independence and they do not want terrorism for terrorism's sake, although they may at times resort to this method as a very effective means of retaliation. The present government exists solely because the foreigners have successfully been able to terrorise the Indian people. The Indian people do not love their English masters, they do not want them to be here, but they do help the Britishers simply because they are terribly afraid of them, and this very fear resists the Indians from extending their helping hands to the revolutionaries, not that they do not love them.

The official terrorism is surely to be met by counter-terrorism A spirit of utter helplessness pervades every strata of our society and terrorism is an effective means of restoring the proper spirits in the society without which progress will be difficult. Moreover the English masters and their hired lakeys can never be allowed to do whatever they like, unhampered, unmolested. Every possible difficulty and resistance must be thrown in their way. Terrorism has an international bearing also, because the attentions of the

enemies of England are at once drawn towards India through the acts of terrorism and revolutionary demonstrations and the revolutionaries are thereby able to form an alliance with them, and thus expedite the speedy attainment of India's deliverance. But this revolutionary party has deliberately abstained itself from entering into this terrorist campaign at the present moment even at the greatest of provocations in the form of outrages committed on their sisters and mothers by the agents of a foreign government, simply because the party is waiting to deliver the final blow. But when expediency will demand it the party will unhesitatingly enter into a desperate campaign of terrorism when the life of every officer and individual who will be helping the foreigen rulers in any way will be made intolerable, be he Indian or Europeon, high or low. But even then the party will never forget that terrorism is not their object, and they will try incessantly to organise a band of selfless and devoted workers who will devote their best energies towards the political and social emancipation of their country. They will always remember that the making of nations requires the self-sacrifice of thousands of obscure men and women who care more for the idea of their country, than for their own comfort or interest, their own lives or the lives of those whom they love.

(Sd) Vijoy Kumar
President, Central Council,
The R. P. of India.

উত্তরপ্রদেশের ২৩টি জেলাতে এইচ. আর. এ.'র সভ্যরা সক্রিয় হয়ে

ওঠে। ১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে কলকাতা পুলিস 'সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি' হিসাবে যোগেশ চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছে অজানা হাতের লেখায় 'এইচ. আর এ.'র কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণী পাওয়া যায়। এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে, অ্যাসোসিয়েশনে মোট একশ' জন সভ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সভ্যরা চাঁদা তুলে, নিজেদের সমস্ত অর্থ দলের ভাণ্ডারে দিয়ে অর্থের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কিছুই হয় না। শেষ পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য তারা ডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯২৪ সালের বড়দিনে বামরৌলিতে, ১৯২৫'এর ৯।১০ মার্চ বিচপুরীতে এবং ২৪ মে দ্বারকাপুরে ডাকাতি করা হয়। এই ডাকাতিগুলিতে প্রধান ভূমিকা ছিল চন্দ্রশেখর আজাদ ও রামপ্রসাদ বিসমিল'এর। ১৯২৫'এর ৯ই অগস্ট কাকোরি স্টেশনের কাছে ট্রেনে সরকারী তহবিল লুঠ করার পর চারদিকে আলোড়ন পড়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ যে তদন্ত চালায় তার ফলে দলের মূল নেতারা ধরা পড়েন। বিচারের নামে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা ও রোশন সিং-কে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন বক্সী, গোবিন্দ কর, মুকুন্দী লাল প্রমুখের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিস কোনদিনই ধরতে পারেনি।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে পড়ে। ১৯২৭ সালে দেওঘরে বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দলকে উজ্জীবিত করবার এক পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও ধরা পড়েন। ১৯২৮ সালের অগস্ট মাসে ভগৎ সিং, বিজয়কুমার সিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রভৃতি বিপ্লবীরা দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলাতে সমবেত হন এবং দলকে পুনর্গঠিত করেন। ভগৎ সিং'এর প্রস্তাবে 'সোস্যালিস্ট' শব্দটি নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি

ঘোষণাপত্র

"স্বাধীনতার শিশুতরুকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার মূলে শহীদের রক্তসিঞ্চন করতে হয়।

যুগের পর যুগ ভারতের মুক্তির তরুমূল বিপ্লবীদের বুকের রক্তে সিক্ত হয়ে চলেছে। কে সাহস করবে,—তারা যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং যে ত্যাগের সাধনায় ব্রতী হয়েছে, তার মহত্ত্বকে পরিমাপ করতে ? তবু তারা নিঃশব্দে এবং গোপনে কাজ করে চলেছে বলেই দেশ তাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা সম্বন্ধে অবহিত নয়। তার জন্যেই হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'এর এই ঘোষণাপত্র।

সশস্ত্র ও সুসংহত অভ্যুত্থানের দ্বারা ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করতে বিপ্লবকে জাগিয়ে রাখতে হবে। সেই কাজই করবে এই সংঘ। সশস্ত্র বিদ্রোহের আগে পরাধীন দেশকে গোপন প্রচার ও প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হয়। প্রস্তুতির কাজ যখন সম্পূর্ণ করা যায়, তখন বিদেশী সরকারের ক্ষমতাও শিথিল হয়ে যায়, তার অস্তিত্বও সীমিত হয়ে পড়ে।

সংস্কারে আবদ্ধ ও রক্ষণশীল মানুষের মনে 'বিপ্লব' সম্পর্কে একটি ভীতির ভাব আছে। শক্তি ও সুবিধাকে যারা কবায়ত্ত করে বসে থাকে, ওলট-পালটের কথা তারা ভাবতেই পারে না। অথচ বিপ্লব একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, এবং বিপ্লব ছাড়া সমাজে বা শাসনব্যবস্থায় কোন প্রগতি কখনো আশা করা যায় না। বিপ্লব অর্থে নিশ্চয়ই আমরা এক পাশবিক হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ বা বোমা ছোঁড়াছুড়ি বুঝব না; সভ্যতার নীতিগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া অথবা ন্যায় ও সততার মূল্যবোধকে ভেঙে দেওয়াও বিপ্লব নয়। বিপ্লব হতাশাবাদীদের চিৎকারও নয়। বিপ্লবকে ধর্মের বিরুদ্ধে পরিচালিত বলে মনে হতে পারে কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে বলে ভুল করবার কোন কারণই নেই। বিপ্লব হল এক প্রবল জীবনীশক্তি যা অনন্তকাল ধরে নূতন ও পুরাতনের, জীবন ও মৃত্যুর এবং আশা ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিপ্লব হল নিয়ম ও নীতির জনক এবং সত্যের বাহক।

আমাদের তরুণ সমাজ এই সত্যকে অনুভব করেছে। তারা অনেক দুঃখে এইটুকু জেনেছে যে, চরম বিশৃঙ্খলা, বর্বরতা ও বিদ্বেষের যে প্রকাশ আজ দেশকে আচ্ছন্ন করেছে, তার জায়গায় শৃঙ্খলা, আইন এবং মৈত্রীর সিংহাসন বসাতে হলে বিপ্লব ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।······

এখন সবার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, অহিংসার অর্থহীন ও এলোমেলো কথার স্রোতে গা ভাসানোর প্রবণতা। মহাত্মা গান্ধীকে আমরাও মহৎ বলে মনে করি ; কাজেই দেশের মুক্তির জন্য তাঁর নীতি অচল এ কথা বলে তার প্রতি কোন অশ্রদ্ধা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন দেশের সকল মানুষের মধ্যে যে জাগরণ এনেছে সে কথা অস্বীকার করে আমরা অকৃতজ্ঞতা দেখাতে চাই না। কিন্তু আমরা মনে করি, গান্ধী অসম্ভবের স্বপ্ন দেখেন। অহিংসা মহৎ আদর্শ হতে পারে কিন্তু তাকে আগামীকালের জন্য তুলে রাখতে হবে। আজ যে অবস্থায় আমরা আছি তাতে অহিংসায় স্বাধীনতা পাওয়া দুরাশা মাত্র! সমস্ত পৃথিবী তার নখ দাঁত শানাচ্ছে। পৃথিবীর এই হিংস্রতার মধ্যে দাঁড়িয়ে অহিংসার কথা বলা উচ্চ আদর্শের হলেও আমাদের মত পরাধীন জাতি এইভাবে আমাদের উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতে পারে না। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যখন শাসন ও শোষণের হিংস্র প্রকাশ, তখন আমাদের মত অসহায় জাতির অহিংসার পথ আঁকড়ে থাকার কি অর্থ থাকতে পারে! মধ্যরাত্রের স্বপ্নে আমাদের যুবকসমাজ নিমগ্ন থাকতে পারে না, এ কথা আমরা জোর দিয়েই বলতে চেয়েছি।......

সন্ত্রাসবাদের পথ নেওয়ার জন্য আমাদের তিরস্কার করা হয়েছে। আমরা তথাকথিত অহিংসবাদীদের উদ্দেশ্যে বলতে পারি যে, সন্ত্রাসবাদকে বিপ্লবের উদ্দেশ্য তো নয়ই, স্বাধীনতা লাভের উপায় বলেও আমরা মনে করি না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন আজ সমগ্র দেশের ওপর সন্ত্রাসের যে পীড়ন চালিয়েছে তার প্রতিবাদ করতে হলে সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষে তার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সমস্ত দেশে আজ যে হতাশা, সমাজে যে ভীতির মানসিকতা তার থেকে দেশকে তুলতে হলে একদিকে প্রতিশোধমূলক কার্য, অন্যদিকে যুবসমাজকে ত্যাগ ও আত্মদানের পথ ধরতে হবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সন্ত্রাসবাদের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল জোর করে চাপানো হয়েছে ভারতবর্ষের ওপর। সমগ্র দেশবাসী আজ যন্ত্রণায় কাতর। কোটি কোটি ভারতবাসী আজ দারিদ্র্য ও অশিক্ষার শিকার। এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ শ্রমিক ও কৃষক ; কিন্তু বিদেশী শাসনের নিপীড়ন তাদের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করেছে।......

শোষিত সম্প্রদায়ের সমস্ত আশা আজ সমাজতন্ত্রবাদকে ঘিরে দাঁড়াতে

চাচ্ছে; আর সমাজতন্ত্রবাদের পথই দেশকে স্বশাসিত করে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যেতে পারে।

ভারতের ভবিষ্যৎ তার তরুণ সমাজের হাতে। তাদের নির্যাতন ভোগ, অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ তাদের হাতেই নিরাপদ হবে। আমরা দেশবন্ধু দাশের সেই কচিৎ উক্তিকে স্মরণ করতে পারি—

'তরুণ সমাজই দেশের গৌরব এবং আশা। সমস্ত আন্দোলনের পেছনে তাদের প্রেরণাই সক্রিয়। তাদের ত্যাগই প্রত্যক্ষ। মুক্তির পথে তারাই মশাল ধরে এগিয়ে চলেছে। মুক্তির তীর্থে তারাই তো তীর্থযাত্রী।'

ভারত-প্রজাতন্ত্রের যুবসৈনিকের দল, তোমরা আজ এগিয়ে এসে দাঁড়াও। অলস হয়ে কাটাবার মত সময় হাতে নেই। সমাজের দীর্ঘ আলস্যের অবসাদকে ঝেড়ে ফেল। দেশের প্রত্যেকটি অংশে তোমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং বিপ্লবের পথকে প্রস্তুত করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা আমাদের মনে জমে উঠেছে, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের বুকে সেই ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাকে ছড়িয়ে দাও। এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন শীঘ্রই চূর্ণ হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। জেগে উঠবে ভারতবর্ষ তার গৌরব ও মহত্ত্বের মাঝখানে।

ব্যক্তিস্বাধীনতাকে আমরা বাঁচাতে চাই। শোষিত শ্রমিকসমাজের অধিকারকে আমরা স্বীকার করাতে চাই। বিপ্লবের আবির্ভাবকে আমরা স্বাগত জানাই। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

কর্তার সিং
সভাপতি"

হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন 'এর আর একটি প্রচারপত্র

বোমার দর্শন

(The Philosophy of Bomb)

গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ তারিখে বড়লাটের বিশেষ ট্রেনটি মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ঘটনার ওপর কংগ্রেসের প্রস্তাব, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় গান্ধীর রচনা এবং সাম্প্রতিক কার্যাবলী দেখে মনে

হবে যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীর সহযোগিতায় বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। সংবাদপত্রে এবং সাধারণ বক্তৃতা-মঞ্চে বিপ্লবীদের সম্পর্কে তিক্ত আলোচনা করা হয়েছে। খুবই দুঃখের বিষয় যে, বিকৃতভাবে দেখানোর দরুন অথবা নিছক অজ্ঞতার জন্য বিপ্লবপন্থী যুবকসমাজকে সাধারণ মানুষ বরাবরই ভুল বুঝে এসেছে। বিপ্লবীরা কখনই তাদের কাজ বা চিন্তাধারার সমালোচনাকে এড়িয়ে চলতে চায় না। বরং এমন সমালোচনার ফলে মানুষ তাদের ভালো করে বুঝবে, তাদের মূলনীতি এবং আদর্শকে অনুধাবন করবে, এই আশাতে তারা সমালোচনাই কামনা করে। আশা করা যাচ্ছে যে, এই প্রবন্ধ সাধারণ মানুষের কাছে বিপ্লবীদের আদর্শ ও কর্মধারাকে তুলে ধরবে এবং স্বার্থান্ধ মানুষের বিকৃত সমালোচনার হাত থেকে মুক্ত করে তাদের প্রকৃত স্বরূপকেই ফুটিয়ে তুলবে।

হিংসা অথবা অহিংসা

আমরা মনে করি, এই শব্দ দুটিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না এবং তাদের অন্তর্নিহিত অর্থও সেজন্য ন্যায়সংগতভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় না। অন্যায় কাজে শারীরিক শক্তিকে প্রয়োগ করার নাম হিংসা। বিপ্লবীরা নিশ্চয়ই তা চায় না। যখন কোন বিপ্লবী বিশ্বাস করে যে, কোন ব্যাপারে তার অধিকার এবং দাবি আছে তখন সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে দাবি জানায়, যুক্তি প্রয়োগ করে, তার সমস্ত আত্মিক শক্তিকে নিয়োগ করে, তার জন্য সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রতা বরণ করে, সেই অধিকার আদায়ের জন্য সে সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করে, এবং সবশেষে তার প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য শারীরিক শক্তিকেও প্রয়োগ করে। এই প্রচেষ্টাগুলিকে বর্ণনা করার জন্য যে কোন শব্দ তুমি ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু 'হিংসা' নয়। কারণ 'হিংসা' শব্দে পাশবিকতার প্রকাশ বোঝায়। 'সত্যাগ্রহ' হল 'সত্য'কে আঁকড়ে ধরা। তা'হলে সত্যকে শুধু আত্মিক শক্তি দিয়ে চাওয়া কেন? সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দৈহিক শক্তি প্রয়োগ নয় কেন? মুক্তিলাভের জন্য দৈহিক শক্তির প্রয়োগকে অহিংসপন্থীরা এড়িয়ে যায়, আর বিপ্লবীরা মুক্তি অর্জনের জন্য আত্মিক বা দৈহিক, সবরকমের শক্তিকেই প্রয়োগ করে। তা'হলে আমাদের সামনে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন থাকছে না। থাকছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শুধু আত্মিক শক্তিকে আঁকড়ে থাকা হবে, না আত্মিক ও দৈহিক সর্ববিধ শক্তিকেই প্রয়োগ করা হবে।

আমাদের আদর্শ

বিপ্লববাদীরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেশের মুক্তি বিপ্লবের পথ ধরেই আসবে। যে বিপ্লবের জন্য তারা কাজ করে চলেছে, তা শুধু এক বিদেশী শাসক ও দেশের মানুষের সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই প্রকট হবে না, তার আবির্ভাবে এক নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। বিপ্লব ধনতন্ত্র এবং শ্রেণীবৈষম্যের অবসান সূচিত করবে। কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষের কাছে আশা ও প্রাচুর্যের বার্তা বয়ে আনবে। যারা আজ শোষণের যূপ-কাষ্ঠে পড়ে মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবে।

সন্ত্রাসবাদ

বিপ্লবের সূচনা যুবসমাজের অস্থিরচিত্ততার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। তারা অস্থির হয়ে ওঠে ধর্মান্ধতার বাঁধনে, হাজার রকমের সংস্কার ও মানসিক অবসন্নতাকে ভেঙে তারা বেরিয়ে পড়তে চায়। এই অস্থির-চিত্ততা যখন একটা সুস্পষ্ট অনুভবে স্থিত হয়, তখন তারা বুঝতে পারে, জাতির পরাধীনতার রূপ কি। সংগে সংগে তাদের মনে স্বাধীনতার জন্য অদম্য স্পৃহা জাগে। পরাধীনতার গ্লানি এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে বলেই সংগত কারণেই অত্যাচারী ও নিপীড়ককে তারা হত্যা করতে ছোটে। এইভাবেই সন্ত্রাসবাদেব জন্ম। সন্ত্রাসবাদ বিপ্লবের একটি অপূরণীয় অংগ। সন্ত্রাসবাদই বিপ্লব নয়, এবং বিপ্লবও সন্ত্রাসের পথ এড়িয়ে পূর্ণ হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ অত্যাচারীর মনে যেমন ভয় ঢুকিয়ে দেয়, অত্যাচারিতের হৃদয়ে তেমনি আশা এবং প্রতি-শোধের মাধ্যমে সাহস ফিরিয়ে আনে। শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে শাসিত ও নির্যাতিত মানুষের সত্তাকে পৃথিবীর চোখের সামনে যেমন তুলে ধরে, তেমনি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জ্বলন্ত করে তুলে পরাধীন মানুষের মনের আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনে। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও সন্ত্রাসবাদ বিপ্লবের রূপ নেবে, এবং দেশের পূর্ণস্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।"

এই বিরাট প্রবন্ধের পরবর্তী অংশটিও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে যে বিষয়গুলি নিয়ে তা'হল যথাক্রমে—

Revolutionary methods ; The Congress and the

Revolutionaries; Gandhi on War Path; Do the Masses believe in Non-violence; The Gospel of Love; What would have happened; The Future of the Congress; Violence and Military Expenditure; The Reforms; The way of Progress; Failure of Non-co-operation; Is it a new era; No Bullying please; An appeal; ও Victory or Death. শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— There is no crime that Britain has not committed in India. Deliberate misrule has reduced us to paupers, has 'bled us white' As a race and a people we stand dishonoured and outraged. Do people still expect us to forget and forgive? We shall have our revenge—a peoples righteous revenge on the Tyrant. Let cowards fall back, and cringe for compromise and peace. We ask not for mercy and we give no quarter. Ours is a war to the end—to Victory or Death.

Long live revolution!

Kartar Singh

President

Hindusthan Socialist Republican Association.

পুলিস রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই প্রচারপত্রগুলি দলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ভগবতীচরণ ভোরার রচনা। তিনি ভগৎ সিংকে উদ্ধারের চেষ্টায় যে বোমা বানাচ্ছিলেন, সেই বোমার বিস্ফোরণেই মারা যান।

ওপরের প্রবন্ধটি পুরোপুরি ছাপা হয়েছে Terrorism in India 1917—1936 (Compiled in the Intelligence Bureau, Home Dept, Government of India) গ্রন্থে।

পরিশিষ্ট—২

ক. লাহোর জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে সরকারী মনোভাব ঃ অগস্ট ১৯২৯-এর ৭ তারিখে যখন অনশনব্রতী বন্দীদেব অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক হয়ে উঠেছে, এবং বন্দীদের প্রতি সহানুভূতিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তখন পাঞ্জাবের গভর্নর স্বরাষ্ট্র-সচিব এইচ. ইমার্সনকে যে নোট পাঠান, তার বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হল। বন্দীদের প্রতি সরকারী মনোভাব কি পরিমাণে কঠোর ও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল, তার পরিচয় এই নোটের মাধ্যমেই সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে।

[File No. 242, Home, Pol.]

"আজ সকালে ডা. গোপীচাঁদ ভার্গবের সংগে আমার যে আলোচনা হয়েছে, তারই একটি অনুলিপি আমি এইসংগে পাঠালাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, বন্দীদের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীতে কাকে বা কাদেব রাখা হবে, এই ব্যাপারে ভগৎ সিং'এর মনোভাবের সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। তার মূল বক্তব্য কাগজে ছাপা হয়ে গিয়েছে। তাতে ছিল যে, হিংসাত্মক অপরাধের জন্য হোক বা না হোক রাজনৈতিক কারণে বন্দী সকলকেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। তিনদিন আগে দুনিচাঁদ'এর কাছে একটি বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ও ৩৯৬ ধারায় যারা দণ্ডিত, তাদের এই বিশেষ শ্রেণী থেকে আলাদা করে রাখা যাবে। গতকাল ডা. ভার্গবের সংগে কথাপ্রসংগে তিনি স্বীকার করেছেন যে, হত্যা ও ডাকাতির সংগে সংশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্য নয়। এর দ্বারা ভগৎ সিং তাঁর পূর্বের গোঁড়ামি ও একগুঁয়ে মনোভাব থেকে সরে এসেছেন। সম্ভবতঃ অহিংসার আশ্রিত কংগ্রেস এই ব্যাপারে বন্দীদের সাহায্য করবে না জেনেই তাঁর মনোভাবের এই পরিবর্তন। তা সত্ত্বেও মনে হয়, খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু সুবিধা দিলেও বন্দীরা অনশন ভাঙবে না, যতক্ষণ হিংসাত্মক কাজেব সংগে যুক্ত কাউকেই বিশেষ শ্রেণীতে দেওয়া হবে না এই মনোভাবের পরিবর্তন না হয়।·········

"আমি আজ সকালে ডা গোপীচাঁদ ভার্গবের সংগে দেখা করেছি এবং

জেনে আমি খুশী হয়েছি যে, তিনি আন্তরিকভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

"অনশন ধর্মঘটীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অফিসিয়াল রিপোর্ট যা পাচ্ছি ডা. ভার্গব তারই সমর্থন জানালেন।··· তিনি মনে করেন যে, যতীন্দ্রনাথ দাস-এর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সারাদিনে তাঁকে আধসের জলও খাওয়ানো যায় না। অত্যন্ত দুর্বল এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে, হাতেপায়েও খিল ধরতে শুরু করেছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর বলে ধরতে হবে।···

"অনশন ভংগ করার জন্য চেষ্টা করার ব্যাপারে বলা যায় যে, ভগৎ সিং-এর বাবা প্রায়ই তাঁর সংগে দেখা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলবতী হওয়ার কোন ইংগিত নেই। দত্তকে প্রায়ই দেখতে আসছেন তাঁর বোন। বাংলা থেকে তাঁর আত্মীয়স্বজনের অনুরোধও প্রতিদিন ডাকে আসছে। কিন্তু দত্ত'র সংকল্পের কোন পরিবর্তন হওয়ার চিহ্ন নেই। আর যতীন্দ্র-নাথ দাস'এর ভাই তার কাছে জেলের মধ্যেই সবসময়েই রয়েছেন। তাঁর ভাই সবসময়েই চেষ্টা করছেন যাতে যতীন্দ্রনাথ কিছু খাদ্য এবং ওষুধ গ্রহণ করেন। কিন্তু যতীন্দ্র অত্যন্ত দুর্বল অথচ তাঁর মনোভাবের কোন পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। যতীন্দ্রনাথের মধ্যে মৃত্যুকে গ্রহণ করার তীব্র আকাংক্ষা; কাজেই কারও কোন অনুরোধ বা ডা. ভার্গবের কোন যুক্তি তাঁর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

"ডা. গোপীচাঁদ ভার্গব মনে করেন যে, বন্দীদের বিশেষ শ্রেণীর দাবি মেনে না নিলে, এ ব্যাপারে মূল নীতির পরিবর্তন না ঘটালে, শুধুমাত্র খাদ্য বা অন্য বিষয়ে কিছু সুবিধা দিয়ে অনশনধর্মঘটীদের নরম করা যাবে না।

"আমি তাঁকে বলেছি যে, তিনি যে আমার সংগে দেখা করে বন্দীদের স্বাস্থ্য ও তাঁদের বক্তব্য আমাকে জানিয়েছেন, সেকথা তাঁদের বলতে পারেন; কিন্তু আমি যে তাঁদের কথা পুনর্বিবেচনা করবো এ ধরনের কোন কথা যেন না বলেন।

"সংক্ষেপে ঃ

সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশন শুরু হলে এই প্রশ্নগুলি উঠবে—

১. লাহোর জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট।

২. রাজনৈতিক বন্দীদের প্রসঙ্গ কোন না কোন ভাবে উঠবেই।

কাজেই আমি যে সব প্রসঙ্গ উঠতে পারে, সেই সেই ব্যাপারে আপনাকে অবহিত করবার চেষ্টা করছি।

"বিভিন্ন বিষয় যথা :

১. অনশনধর্মঘটী বন্দীদের দাবি,

২. বিচারাধীন ও বিশেষ শ্রেণীর বন্দী সম্পর্কিত বর্তমান নীতি,

৩. অন্যান্য দেশে বন্দীদের প্রতি যে আচরণ করা হয়, তার চেয়ে বর্তমান নীতি খারাপ—এমন দাবি,

৪. প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির দ্বারা এ ব্যাপারে কি তদন্ত করা হয়েছে তার বিবরণ,

৫. রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্তদের সম্পর্কে আরও নমনীয় মনোভাব গ্রহণের দাবি,

৬. বর্তমান জেলব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয়দের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আচরণ সম্পর্কে সমালোচনা, এবং

৭. কোন একজনের মৃত্যু ঘটলে গভর্নমেণ্টই তার জন্য দায়ী, এমন অভিযোগ।

"ভগৎ সিং ও দত্ত'র মূল দাবিগুলি তাদের আবেদনপত্রেই রয়েছে। আবেদনপত্রটি বিভিন্ন পত্রিকা ও 'ট্রিবিউন'এর ১৪.৭.২৯ তারিখের সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এই আবেদনপত্রে তারা রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধার দাবি জানিয়েছে। রাজনৈতিক বন্দী বলতে তারা এমন সকলের কথাই বলতে চায়, যারা রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। উদাহরণ স্বরূপ তারা উল্লেখ করেছে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১৫-১৭) এবং কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের কথা। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯১৫-১৭) ওপরে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিরেক্টরের নোটের সংক্ষিপ্ত সারও এই সঙ্গে দিলাম। ওই নোটে বলা হয়েছে যে, ওই মামলার আসামীদের উদ্দেশ্য ছিল—গভর্নমেণ্ট'এর উচ্ছেদ, সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে হত্যা এবং সেনাবাহিনীর আনুগত্যে ফাটল ধরানো। গভর্নমেণ্টকে আজ পর্যন্ত যতগুলি বিদ্রোহাত্মক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। তাছাড়া যখন গভর্নমেণ্ট যুদ্ধে অবতীর্ণ, ঠিক সেই ভয়ংকর সময়টিতেই তারা ষড়যন্ত্র করেছিল। এই ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনাগুলির উল্লেখ করে ওরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মত ঘটনাগুলির গুরুত্বকে লঘু করে দেখাতে চেয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনধারণের মান কি, সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ না করে, তারা রাষ্ট্রদ্রোহের মত অপরাধে যারা অপরাধী তাদের অনুকূলেই এই বিশেষ সুবিধামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন চেয়েছে।······

"কাগজগুলিতে প্রায়ই লেখা হচ্ছে যে, মহামান্য সরকার আইরিশদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন ; সেখানে অভিযুক্তদের রাজনৈতিক বন্দীরূপেই দেখা হয়েছে। বস্তুতঃ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আইরিশ বন্দীদের একটি স্বতন্ত্র জেলে রাখা হয়েছিল এবং প্রথম দিকে তাদের বিশেষ কতকগুলি সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল। এই সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধের সময় বিশেষ কতকগুলি কারণে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইংল্যাণ্ডে যে নীতি নির্ধারিত হয় তাতে 'সিন ফিন' বন্দীদের সাধারণ নিয়মের বাইরে আর কোন সুবিধা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। একটি মাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিল দু'জন অভিযুক্তর সম্পর্কে যাদের অপরাধ ক্ষমা করে প্রথম শ্রেণীতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।······

"এর পরের কথা হল অপরাধের উদ্দেশ্যকে শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে ধরা হবে কিনা। বিরোধী দল এই ব্যাপারটা ফেনিয়ে তুলতে পারে। সরকারী নীতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো চলে—

কোন সভ্য দেশেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে বিশেষ সুবিধাদানের ক্ষেত্র বলে ধরা হয়নি। ইংল্যাণ্ডে তো এ ধরনের মনোভাবকে মোটেই স্বীকার করা হয়নি।

কোন সভ্য দেশেই রাষ্ট্রদ্রোহকে মার্জনীয় বা তুচ্ছ বলে দেখা হয়নি। বরং সভ্য আইনে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নেই।

একথাও ঠিক নয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজে নৈতিক অপরাধ প্রত্যক্ষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, কাকোরী অথবা ঘদর আন্দোলনে নৈতিক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।·····

আর একটি অভিযোগ যার ওপর বিরোধীরা জোর দিচ্ছে, তা হল শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয়দের সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যবহার। এ সম্বন্ধে বলা চলে যে, অপরাধী বন্দীদের স্বাস্থ্য ভালো রাখবার দিকে জেল কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি দিতে হবে, অবশ্য তার জন্য সরকারী অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা চলবে না। যে বন্দীর সাধারণ জীবনযাত্রার মান নিচু, জেলে তাকে উঁচু মানের শ্রেণীতে রাখা হবে এমন আশা করাও ভুল। কাজেই বন্দীদের জেল-জীবন নির্ধারিত হয় ব্যক্তিগতভাবে তাদের জীবনযাত্রার মানের ওপরেও। এই

নিয়ম শুধু ইউরোপীয়ানদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য নয়। যে সব ভারতীয়ের জীবনধারণের মান উঁচু বলে বিবেচিত হবে, তারাও ইউরোপীয়ানদের মত বিশেষ সুবিধাগুলি পেতে পারবে।

"সবশেষে, কোন একজন বন্দীর মৃত্যু হলে গভর্নমেণ্টের ওপর সকল দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা হবে। এ বিষয়ে বলা চলে—

অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে অভিযুক্তরা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে, যা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। জেল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করবে, যাতে এই অপরাধ নিবারণ করা যায়। জেল-ডাক্তারেরও দায়িত্ব যে কোনভাবেই হোক তাঁর অধীন রোগীর প্রাণরক্ষা করা। লাহোরের জেল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারেরা এই অনশনব্রতীদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট এবং পাঞ্জাবের গভর্নর চেষ্টা করেছেন এই ধর্মঘটের অবসান ঘটাতে।···

"সম্ভবতঃ একথাও বলা হবে যে, ভগৎ সিং এবং দত্ত'র দাবিগুলি পুরোপুরি মেনে না নেওয়ার দায়িত্বও গভর্নমেণ্টের। এই দাবিগুলি আগেই জানানো হয়েছে, এবং তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মানতে না পারার কারণও দেখানো হয়েছে। গভর্নমেণ্ট যে নীতিগুলি অনুসরণ করে চলেছেন তা থেকে বিচ্যুত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কাজেই এভাবে চাপ সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টাকে সরকার বরদাস্ত করবেন না।

"সবশেষের কথা এই যে, এ ব্যাপারের জন্য পুরো দায়িত্ব ওই যুবক-দেরই, এবং যারা বাইরে থেকে নানাভাবে যুবকদের উত্তেজিত করছে, তাদেরও।

খ. লাহোর জেলে অভিযুক্ত বন্দীদের অনশন ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিতর্ক ঃ

[Vol. IV, No. 5, dt. 12.9.29]

এন. সি. কেলকার ঃ অনশনব্রতী বন্দীরা তাদের ধর্মঘটের ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছে, সেই গুরুত্ব দিয়েই ওদের কাজকে বিচার করতে হবে। তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত কিন্তু জীবনের বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্যও তারা চায়। তাদের দাবি হল, স্বাধীনতার সংগ্রামে রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি। এই মূল্যই তারা চেয়েছে তাদের ধর্মঘটে। কাজেই সাধারণ মানুষ এবং আইন সভার সদস্যদের সহানুভূতি যে তাদের

জন্যে থাকবে না, এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে? পৃথিবীতে যে কোন প্রকারের কৃচ্ছ্রতা সাধন ও নির্যাতন ভোগ অপর মানুষের সহানুভূতি সৃষ্টি করে। যদি টেরেন্স ম্যাকস্যুইনির কথাই তুলি, তিনি কি সমস্ত মানুষের সহানুভূতি লাভ করেন নি? এবং তার সংগে সংগে তিনি কি আইরিশ জাতির স্বাধীনতার দাবিকেও তুলে ধরেন নি?……

লালা লাজপত রায়ের ওপর পুলিসী আক্রমণের ব্যাপারে যখন এই সভাতেই আলোচনা করা হয়, তখন সরকারী বেঞ্চ থেকে একজনও দাঁড়াননি পুলিসের আচরণের নিন্দা করতে। তাঁরা আজ কি করে আশা করেন যে, লাহোর জেলে বন্দীদের অনশনের নিন্দা করবে অন্যে?……আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, তোমরা আমাদের কোন সহানুভূতি আশা করতে পারো না। এই সভার সবটুকু সহানুভূতিই আজ ওই অনশনব্রতী বন্দীদের জন্য।……

দেওয়ান চমনলাল ঃ……অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, জেল-কমিটির পাঁচজন সভ্যই অনশন ধর্মঘটীদের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁরা ধর্মঘটী বন্দীদের জানিয়েছিলেন যে, যতীন দাসকে মুক্তি দেওয়া হবে।

জেমস ক্রীরার ঃ সেই বিবৃতির ইতিমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে।

চমনলাল ঃ আমি বলেছি যে, জেল-কমিটির পাঁচজন সভ্য ধর্মঘটী বন্দীদের সংগে দেখা করতে গিয়ে কথা দিয়ে এসেছিলেন যে, যতীন দাসের অবিলম্বে মুক্তি তাঁরা অনুমোদন করবেন। আমি আশা করি, মাননীয় স্বরাষ্ট্রসচিব সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থেকে আমার কথার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করবেন না।

জেমস ক্রীরার ঃ আমি কি মনে করিয়ে দিতে পারি যে, পাঞ্জাব সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ওই বন্দীর জামিনের জন্য আবেদন করা হলে তারা আপত্তি করবেন না?

চমনলাল ঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্রসচিব আমাকে কিছু মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমিও তাঁর কথাতেই আসছি। যদি এমন একটি বিবৃতি দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার কথা অনুমোদন করার অর্থ কি? মুক্তির অর্থ কি জামিন? অবিলম্বে মুক্তি বলতে জামিনে ছাড়া বোঝায় না। যদি মাননীয় সভ্যমহাশয় বিচারবিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলে মনে করেন, তাহলে কখনই জামিনে মুক্তি দেওয়ার কথা উঠতে পারে না। কারণ জামিনে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপার পুরোপুরি বিচারকের ওপর নির্ভর করছে। তা'হলে

অবিলম্বে মুক্তির জন্য জেল-কমিটি যে সুপারিশ করলেন, তাকে জামিনে মুক্তির সংগে সরকার কিভাবে জড়ালেন ? জেল-কমিটির সুপারিশের একটাই অর্থ হয়। তা'হলো যতীন দাসকে জেল থেকে এবং মামলা থেকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া······

জাহাঙ্গীর মুন্‌শি ঃ তার উদ্দেশ্য মহৎ বলে যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে, তার উদ্দেশ্য'র সাফল্যের সংগে সমস্ত দেশের মানুষ জড়িয়ে আছে বলে যখন সে মনে করতে পারে এবং যখন তার নিজের হৃদয়ও মহৎ তখনই শুধু সেই মানুষ অনশন গ্রহণ করতে পারে। হতে পারে, ভগৎ সিং অপরাধ করেছে, হয়তো দত্ত বা অভিযুক্তদের আর কেউ অনুরূপ অপরাধ করেছে কিম্বা করেনি, কিন্তু যেদিন এই সভার প্রত্যেকটি মানুষ স্মৃতি থেকে নিঃশেষে মুছে যাবে, সেদিনও ওই যুবকদের ইতিহাস দেশের হৃদয়ে সোনার অক্ষরে আঁকা থাকবে তাদের আত্মোৎসর্গের জন্য। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার প্রাণ। ওরা তা-ই দান করতে চলেছে তাদের কর্তব্য পালনের জন্য। এই সরকারের যদি কোন কান্ডজ্ঞান থাকতো, যদি মন দিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ সরকারের থাকতো, তাহলে ওদের দাবিপূরণে এতদিন বিলম্ব ঘটতো না। সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ আমাদের দিকে চেয়ে আছে, সমস্ত পৃথিবী লক্ষ্য করছে যে ভারত শুধু ভীরুর দেশ কিনা, এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন পরাধীনতার মধ্যে থেকেও 'না' বলবার সাহস তাদের আছে কিনা······

এইচ. ডবলিউ. ইমার্সন ঃ এই সভায় একথা বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাব সরকার আর যাই করুক, যতীন দাসকে নিঃশর্ত মুক্তি না দেওয়ায় তারা অবিজ্ঞতা ও অমানবিকতার কাজ করেছে। দেওয়ান চমনলাল বলেছেন যে, জেল-কমিটির অনুমোদন মেনে নেওয়াই পাঞ্জাব সরকারের পক্ষে উপযুক্ত হত। কিন্তু জেল-কমিটির সদস্যরা যা বলেছিলেন তা হল, যতীন দাসের মুক্তির জন্য তাঁরা সুপারিশ করবেন। তাঁরা নিঃশর্ত মুক্তি অথবা জামিন কোনটা মনে রেখে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। কিন্তু ধর্মঘটের অবসানের জন্য তাঁরা যে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য সরকার তাঁদের প্রশংসা করেন।······পাঞ্জাব সরকারের সামনে দু'টি পথ খোলা ছিল—প্রথমটি হল দাসের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া, এবং দ্বিতীয়টি তাঁরা যা করেছেন, অর্থাৎ জামিনের বিরোধিতা না করা। কি কারণের জন্য তাঁরা মামলা তুলে নিতে পারেন না, তা নিশ্চয়ই সকলের·

জানা আছে। যদি একথা মনে করে নেওয়া হয় যে কোন একজন অভিযুক্ত নিরপরাধ, আমার বরং বলা উচিত যে যতক্ষণ না কোন একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে নিরপরাধ বলেই মনে করা যায়···

এম. এ জিন্না : তা'হলে এ মামলা প্রত্যাহার করুন।

ইমার্সন : আমার বক্তব্যের প্রথম অংশটুকু তুলে নিচ্ছি। কিন্তু যতক্ষণ একজনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রয়েছে ততক্ষণ অন্য কারও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই একটি অভিযোগে আরও অনেক লোক জড়িয়ে আছে। আর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা তা'হলে এইভাবে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করবে।

মহম্মদ আলি জিন্না : একটু আগে এই সভার বক্তা বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা অভিযুক্তদের জন্য থাকবেই। আমি সেই সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেই বলছি। এবং আমার সহানুভূতি ওই যুবকদের জন্য এই কারণে যে, তারা সরকারী নিয়মের যুপকাষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন······

"ইউরোপীয় বা ভারতীয় মান বলতে কি বোঝায়, এ প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় হোম মেম্বার মি. নিয়োগীর দেওয়া সংজ্ঞাই মেনে নিয়েছেন যে, জেলের আইনে টুপি ও ইউরোপীয় পোশাক উচ্চ মানের পরিচায়ক। তাই যদি হয়, তাহলে ভগৎ সিং ও দত্ত'র ক্ষেত্রে অন্য ব্যবহার কেন? তারা দু'জনেই ত পুরো ইউরোপীয় পোশাকেই এসেছিল।······

"আমি যতই এ ঘটনাগুলি দেখছি, আর সরকারী মনোভাব বিশ্লেষণ করছি, ততই আমার মনে হচ্ছে—এ যেন একটা যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপার···

"লাহোর মামলার কথাই ধরা যাক। এই যুবকগুলি মৃত্যুবরণের জন্য দৃঢ়সংকল্প। এটুকু নিশ্চয়ই তোমরা অনুভব করতে পারো যে, অনশনে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তার পক্ষেই এ কাজ সম্ভব যার মধ্যে মহৎ আত্মার অস্তিত্ব আছে, এবং যে তার কাজের সততায় বিশ্বাসী। এরা নিশ্চয়ই সেই ধরনের অপরাধী নয় যারা স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, ধূর্ত এবং অন্যায়ে লিপ্ত। তোমরা স্থিরমস্তিষ্ক তার্কিক হতে পারো, আমিও ধীরভাবে এখানে বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু মনে রেখো যে, বাইরে হাজার হাজার যুবক আজ অপেক্ষা করে আছে। শুধু এই দেশেই এমন ঘটনা ঘটে না। অন্য দেশেও এবং পাকাচুল প্রবীণরাও এমন ভাবেই এগিয়ে গেছে। তারা স্বদেশ চিন্তাতেই

এমন সব গুরুতর অপরাধ করেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কসগ্রেভের ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল ? প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে আহূত হওয়ার এক পক্ষকাল আগেও কি তিনি ফাঁসির আসামী ছিলেন না ? তিনি কি নিছক এক অর্বাচীন তরুণ ছিলেন ?

"যদি পাঞ্জাব সরকারের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা কিছু থাকত, যদি তাদের মস্তিষ্ক বলে কোন পদার্থ থাকত, তাহলে এ ব্যাপারের একটা সমাধান অনেক আগেই হয়ে যেত। It is a question—the more I examine it and the more I analyse it, I find in it a question of declaration of war. তারা যেন এই কথাই বলতে চাচ্ছে—আমরা সবকিছু সম্ভবমত দেখবো, সব উপায়ের সন্ধান করবো, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হবে, হয় তোমাদের ফাঁসিতে ঝোলানো, আর নইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা······দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ভারতের যুবসমাজ আজ জেগে উঠেছে। এই পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা কিছুতেই পারবে না এ ধরনের অপরাধ নিবারণ করতে, যতই বল তারা বিভ্রান্ত এবং যত নিন্দাই কর ওই যুবকদের।"

গ. অনশন ধর্মঘট এবং যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মুলতুবী প্রস্তাব ও বিতর্ক[৫৭]

[সিমলায় ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ তারিখে আইন সভার অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু]

পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু ঃ স্যর ! এই সভা আমাকে অনুমতি দেওয়ায় আমি আমার প্রস্তাব রাখছি। আমি ইতিপূর্বেই আমার প্রস্তাব পাঠ করেছি···

সভাপতি ঃ প্রস্তাব হচ্ছে যে, সভা মুলতুবী রাখা হোক।

নেহরু ঃ প্রস্তাবে বলেছি যে, এই সভা এরপর মুলতুবী রাখা হোক। কারণও আমি বিশ্লেষণ করেছি। এই গভর্নমেণ্ট লাহোর জেলে বিচারাধীন অভিযুক্তদের সম্পর্কে যে ধরনের ব্যবহার করছেন, তার ফলে যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু ঘটেছে এবং অন্যেরাও মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছে।

"স্যর ! এ প্রস্তাবে ভারত বা পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-

ভংগের অভিযোগ নেই। অভিযোগ হচ্ছে, গভর্নমেণ্ট এই ব্যাপারে মানবিকতাবোধের অভাব দেখিয়েছেন। অভিযোগ হচ্ছে যে, মানুষের জীবন যখন তিল তিল করে ক্ষয়ে যাচ্ছে তখন তাঁরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তা দেখেছেন ; তাঁদের যা করা উচিত ছিল, তাঁরা তা করেন নি। জুন মাসের মাঝামাঝি অনশন শুরু হয়েছিল। এবং যতীন্দ্রনাথ দাস ৬১ দিনের দিন (জনৈক সদস্য—৬৩ দিন) ৬৩ দিনের পর মারা যান। প্রতিদিন খবর আসতো তাঁর প্রাণ ফুরিয়ে যাচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। খবর এসেছে যে, অন্যদের অবস্থাও আশংকাজনক হয়ে উঠেছে। কি করেছেন তখন আমাদের সরকার ? শোনা যায়, রোম যখন আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে, নীরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আমাদের এই দয়ালু সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তাঁরা এই যুবকদের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে বেহালা বাজিয়ে চলেছেন·········যখন সময় ছিল বোঝার যে, এই মহৎপ্রাণ যুবকেরা যতদিনই হোক অনশনেই থাকবে, কিন্তু তাদের নীতি থেকে বিচ্যুত হবে না, কি করেছেন আমাদের সরকার তাদের প্রাণরক্ষার জন্য ?······যখন একটি একটি করে প্রাণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সরকার ভাবছেন, এই পরিস্থিতিতে কি করা যায় ? যদি এই ঔদাসীন্যও ভর্ৎসনার যোগ্য না হয়, তা'হলে ভর্ৎসনা কথারই কোন অর্থ থাকে না।

জেমস ক্রীরার ঃ·········মাননীয় পণ্ডিতের কাছ থেকে এখনও আমার শোনার সুযোগ হয়নি যে, গভর্নমেণ্টের কি করা উচিত ছিল।

মোতিলাল নেহরু ঃ একথা পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, গভর্নমেণ্টের কর্তব্য ছিল অভিযুক্ত যুবকদের দাবিগুলি পুরো জেনে নেওয়া।

বিভিন্ন সদস্য ঃ বর্ণবৈষম্যের যে নীতি গভর্নমেণ্ট রেখেছেন, তার বিলোপ করা।

অমরনাথ দত্ত ঃ স্যর ! যে মহৎ প্রাণকে আমরা আজ হারিয়েছি তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার অশ্রুজলের অর্ঘ্য দিতে আমি দাঁড়িয়েছি, অন্য দিনের মত বিতর্কে যোগ দিতে নয়। আমরা আজ সমবেত হয়েছি এক জাতীয় দুর্যোগের দিনে। আমাদের দুঃখ ও পরাধীনতার প্রতি এতটা নির্বিকার না হয়ে এই গভর্নমেণ্ট যদি একটু হৃদয়বান হত ! কিন্তু সে হল অলস কল্পনা। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামে আমরা কোন সহানুভূতি এই সরকারের কাছে আশা করতে পারি না। মুক্তির সংগ্রামে

ভারতের ম্যাকস্যুইনির এই আত্মদান যে কোন সহৃদয় মানুষের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করতো। ওই যে জেমস ক্রীরার নামক ভদ্রলোক, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সততায় আমি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি না, কিন্তু যে জেমস ক্রীরার মানবসমাজের একষষ্ঠাংশকে অধীন করে রাখার কুচক্রের মেরুদন্ড, তার সততা বা অকপটতায় আমার কোন বিশ্বাস নেই।

"ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাথমিক দাবিগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি আত্মদান করেছেন, সেই যতীন্দ্রনাথকে হত্যার জন্য আমি এই গভর্নমেণ্টকে অভিযুক্ত করছি। এই যুবকদের জীবনের উপাদান কি তা গভর্নমেণ্টের ভালোভাবেই জানা আছে। আমরা যে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করছি বা এখানে যে সোরগোল তুলছি, গভর্নমেণ্ট তার জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নয়, কিন্তু গভর্নমেণ্ট ভালভাবেই জানে, যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তিল তিল করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে পারে, যারা নিজেদের জীবনে গীতার অমৃত বাণী 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ'-কে মন্ত্র করেছে তারা এই ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনরূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রচন্ড বিপজ্জনক······

"আমি ভারত ও পাঞ্জাব সরকারকে হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করছি। হত্যাকারী না হলে মৃত্যুর দূত যখন তার পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আসে, তখন তারা কিভাবে নির্বিকার ঔদাসীন্যে আনন্দ করে? তাদের কাজের বিচারে বসবে এমন ধর্মাধিকরণ পৃথিবীতে নেই। আমি জানি না তারা ধর্মে বিশ্বাস করে কিনা, খ্রীষ্টধর্মে বলা হয়েছে শেষ বিচারের দিন আসবেই—সে কথায় তারা বিশ্বাস করে কিনা। তাদের যদি এ বিশ্বাস না থাকে—এবং আমার ধারণা তাদের নেই, তবু একদিন তাদের হত্যাকারী হিসাবেই কাঠগড়ায় উঠতে হবে, যেদিন ইতিহাস মানবতার কষ্টিপাথরে তাদের বিচার করবে।

"আমি তাদের হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করছি। কেন? কারণ, এ' বিপদ এড়ানো যেত, কিন্তু তারা তা চায়নি। আমার মনে পড়ছে সেই উক্তিটি—ঈশ্বর যাদের ধ্বংস করতে চান, তাদের বিবেক আগে নষ্ট করে দেন। এটা তারই উদাহরণ, এবং আমি সেই আশা নিয়েই বাঁচবো যে, তাদের বিবেকশূন্য করে ঈশ্বর এই গভর্নমেণ্টের অনিবার্য পতনের সূচনা করেছেন।···

"আমি তোমাদের এইকথাই বলতে চাই যে, তোমাদের পাপের ভারেই তোমাদের ডুবতে হবে। তোমাদের ওই পতাকা ধুলোয় লুটোবে।

ডেনিস ব্রে (বৈদেশিক সচিব) ঃ আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে উচ্ছৃংখল ভাষায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, আমি তা ঘৃণার সংগে উপেক্ষা করছি। তাঁর অগ্নিসম্পাতের পর এখন কিছু শান্ত ভাষায় কিছু যুক্তি ও যুক্তিযুক্ততার কথা শোনা যেতে পারে। আমার ওপরে একটা অভিশাপ আছে যে, আমি কোন কিছুরই একটা দিক দেখে খুশী হতে পারি না। অন্যদিকটাও দেখতে চাই।······

"অনশন ধর্মঘটের ইতিহাসে একথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, এই আত্মনির্যাতনের পথে তারাই যেতে পারে যারা তাদের উদ্দেশ্য'র সততায় প্রবলভাবে বিশ্বাস করে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই দুর্ভাগ্য যুবক মৃত্যুবরণ করেছে এমন উদ্দেশ্য সামনে রেখে, যার সত্যতায় তার অটুট প্রত্যয় ছিল। আর শহীদের রক্ত দিয়েই গীর্জার ভিত্তি রচিত হয়।

"কিন্তু যদি অন্যদিক থেকে দেখি······হঠাৎ জেল-আইনের আমূল পরিবর্তন, যা সমস্ত আইনব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারে, তার দাবিকে হঠাৎ মেনে নেওয়া গভর্নমেণ্টের ক্ষমতার বাইরে নয়কি ? তা'ছাড়া এই পরিবর্তন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা রাজনীতির ছায়ায় দাঁড়িয়ে কুৎসিৎ অপরাধ করে, যারা হত্যার অপরাধে বিচারাধীন······নির্মম হত্যাকারীর সম্পর্কে অতি উদারতা দেখানোই কি গভর্নমেণ্টের কর্তব্য ?

এইচ ডবলিউ. ইমার্সন (স্বরাষ্ট্রসচিব) ঃ মাত্র দু'দিন আগে এই সম্পর্কে আলোচনা করার পর আজ আবার যে একই আলোচনায় নামতে হবে, তা আমার মনে হয়নি। বিরুদ্ধ পক্ষ যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তার মধ্যে কিছু কিছু কথা আছে যার সঠিক উত্তর দেওয়াও শক্ত। এক সময় আমার মনে হয়েছে যে, দাবিগুলি ধর্মঘটীদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর তখনই প্রশ্ন জেগেছে যে, এগুলো কি মেনে নেওয়া যেত না ? তারপরেই দেখেছি যে, না—এর সংগে জড়িত সাধারণ রাজনৈতিক সমস্যা এবং জাতিগত বৈষম্যের প্রশ্ন। মিয়ানওয়ালি জেল থেকে ভগৎ সিং ১৪ই জুন তারিখের চিঠিতে বলেছেন—এগুলি ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় ; এর সংগে জড়িত সাধারণ নীতির প্রশ্ন। আমার দিক থেকে কোন সন্দেহই ছিল না যে, যে যুবকের মৃত্যুর জন্য আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি, তিনি যা সঠিক বলে মনে করেছেন তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন, এবং তাই করেছেন। মৃত্যুর জন্য তাঁর দৃঢ়তা, খাদ্যগ্রহণে অস্বীকৃতি এ ব্যাপারে সমাধানের কোন পথ রাখেনি······প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ব্যবস্থা গ্রহণে এত দেরি

হয়েছে কেন? আমি আগেই বলেছি যে, এ'দের দাবিগুলিকে সাধারণ নীতিগত দাবি থেকে বিচ্যুত করে দেখা চলে না।……

[জনৈক সদস্য—কেন চলে না?]

মহম্মদ আলি জিন্না: সেই সাধারণ দাবিগুলি কি?

ইমার্সন: রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে আরও উন্নত ব্যবস্থা এবং জাতিবৈষম্যের বিলোপ।……যদি কোন গভর্নমেণ্টকে এই নীতিতে কাজ করতে হয় যে, বিচারাধীন বন্দীরা অভিযোগ তুললেই বিনা তদন্তে তৎক্ষণাৎ সেই অভিযোগের নিরসন করতে হবে, তাহলে স্যর! আমি মনে করি, কোন গভর্নমেণ্টের পক্ষেই কাজ চালানো সম্ভব নয়। আমি বলেছি যে, আমি মনে করি যতীন্দ্রনাথ দাস নীতির প্রশ্নেই প্রাণ দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে—বর্তমান অবস্থার সৃষ্টিই হয়েছে নীতির সংঘাত থেকে……গত দু'মাস ধরে লাহোরে অনশন ধর্মঘটের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট এবং ভারত গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। গভর্নমেণ্ট যা করেছে বা যে ব্যবস্থা নিয়েছে, মাননীয় সভ্যরা বিশ্বাস করতে পারেন, তার সংগেও নীতি ও নিয়মের প্রশ্নই জড়িত।

কয়েকজন সদস্য: কি সেই নীতি? জাতিবৈষম্যের পোষণ?

ইমার্সন: নীতি হল এই যে, সমাজ ও পরবর্তী যুগের অছি হিসাবে গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয় এই ধরনের দাবি মেনে নেওয়া……

কে. সি নিয়োগী: আমি মনে করি না, যিনি দ্বিতীয়বার এই সভায় তাঁর নীতির প্রশ্নে একই কথার পুনরুক্তি করেন, তাঁর কথায় একই গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। মি. ইমার্সন যখন কথা বলছিলেন, আমার মন তখন ভেসে গিয়েছে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। যখন শক্তিমত্ত পাঞ্জাব সরকারের কর্মচারীরা, আজ এখানে সরকারী বেঞ্চে যাঁরা বসেছেন তাঁদের পূর্বসূরীরা, নিজেদের সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসমর্থনযোগ্য কাজের সাফাই গেয়েছিলেন। ডায়ার এবং ও'ডায়াররা এদেশের মাটি ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু যে মুহূর্তে এই গভর্নমেণ্ট মনে করবে, সেই ডায়ারের নীতি নির্দ্বিধায় আবার চালু করবে, এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।……যে প্রদেশ যতীন দাস-এর মত মহৎ জীবনকে জন্ম দিয়ে ধন্য সেই প্রদেশের অযোগ্য প্রতিনিধি আমি, বাংলার মুখ উজ্জ্বল-করা সন্তানের উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও বেদনার অর্ঘ্য দিতে এসেছি। জানি, আমরা আজ যত বেদনায় ও অশ্রুজলেই এই শ্রদ্ধা নিবেদন করি না কেন, যতীন্দ্রনাথ আর ফিরে

আসবেন না।······এই ঘটনা এবং অন্য ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায়, গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপারে কি নির্বিকার ও নির্বোধের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

সভ্যবৃন্দ : এবার আমাদের প্রস্তাব উত্থাপন করা যেতে পারে।

সভাপতি : পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু।

মোতিলাল নেহেরু : আমার বক্তব্য আমি আগেই রেখেছি।

সভাপতি : এই সভা তবে এখানেই বন্ধ রাখা হল।[৫৮]

[Home Deptt. 1929. Political file No. 21/63]

ঘ. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সর্দার ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত এবং অন্যান্যের আবেদনপত্র। এই পত্রে তাঁরা স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে জানিয়েছেন, জেল আইনের নতুন ধারায় প্রদত্ত সুবিধাগুলি তাঁদের দেওয়া না হলে তাঁরা আবার অনশন শুরু করবেন

২০. ১ ১৯৩০ তারিখে তারবার্তার মাধ্যমে আপনার কাছে আমাদের যে দাবিগুলিকে জানিয়েছি, এখনও তার কোন উত্তর পাইনি। আমাদের সেই তারবার্তায় আমরা বলেছি :

Home Member, India Government, Delhi Undertrials, Lahore Conspiracy Case and other Political Prisoners suspended hunger-strike on the assurance that the India Government was considering Provincial Jail Committee's Report. All India Conference over. No action taken yet. As vindictive treatment to political prisoners still continues we request we be informed within a week final Government decision—Lahore Conspiracy Case Under-Trials.

পাঞ্জাব জেল এনকোয়ারি কমিটি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, শীগগিরই রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের নীতি সন্তোষজনকভাবেই মিটে যাচ্ছে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁরা অভিযুক্ত তাঁরা এবং অন্য বন্দীরা এই আশ্বাস পেয়েই অনশন ভংগ করেছেন। তাছাড়া আমাদের

মহৎ বন্ধু শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, সেখানেও জেমস ক্রীরার সেই একই আশ্বাস দেন। একথা বলা হয়েছিল যে, গভর্নমেণ্টের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, এবং রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের ব্যাপারও গভর্নমেণ্ট সহানুভূতির সঙ্গেই দেখছেন। যে সকল রাজনৈতিক বন্দী বিভিন্ন জেলে তখন অনশন করে চলেছিলেন, তাঁরা এরপর অনশন ভঙ্গ করেন।

ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট তাদের রিপোর্ট দাখিল করেছে। বিভিন্ন প্রদেশের কারাসমূহের পরিদর্শকদের যে সভা লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়, এবং ভারত গভর্নমেণ্ট দিল্লীতে যে সম্মেলন ডাকেন, তাতেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়। তারপর একমাস পার হয়ে গেছে কিন্তু গভর্নমেণ্ট এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এই দীর্ঘসূত্রী মনোভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমরাও সন্দিহান হয়ে পড়েছি যে, হয়তো অনুমোদনগুলিকে আপাততঃ চেপে রাখার চেষ্টা চলেছে। গত চার মাস ধরে ধর্মঘটী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর ওপর যে প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার করা হয়েছে তাতে আমাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে। আমরা এ ধরনের ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি—

১. লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের বন্দী বিজনকুমার ব্যানার্জী অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। শাস্তিস্বরূপ তাঁর জেলের মেয়াদ যেটুকু কমার কথা ছিল, সেটুকুকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নিয়মে গত ডিসেম্বরে তাঁর মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর জেলের মেয়াদ চার মাস বেড়ে গেছে। ওই একই জেলে একই শাস্তি দেওয়া হয়েছে বাবা সোহন সিংকে। অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্যে সর্দার কাবুল সিং, সর্দার গোপাল সিং (মিয়ানওয়ালি জেল), এবং মাস্টার মোটা সিংকেও (রাউয়ালপিণ্ডি) অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

২. অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্যে আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে আটক শচীন সান্যাল, রামকুমার ক্ষেত্রী ও সুরেশ ভট্টাচার্য, রাজকুমার সিংহ, শচীন্দ্রনাথ বক্‌শী এবং মন্মথনাথ গুপ্ত প্রভৃতি কাকোরী মামলার বন্দীদের আরো কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। শোনা গেছে, শচীন সান্যালকে বেড়ি পরিয়ে নির্জন সেলে রাখা হয়েছে। তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সুরেশ ভট্টাচার্য টি. বি. রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে শোনা

যাচ্ছে। এ ছাড়া অন্যান্য বন্দীকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের······সকল সুযোগ-সুবিধাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে।···

অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তার অনুলিপি বন্দীদের হাতে দেওয়া হয়নি।

২৩ ও ২৪ অক্টোবর, ১৯২৯, উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারের নির্দেশে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বন্দীদের ওপর প্রবল পীড়ন চালানো হয়। আমাদের মধ্যে একজনের দেওয়া বিবৃতিও আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে ১৬. ১২. ১৯২৯ তারিখে। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট বা ভারত গভর্নমেণ্ট আমাদের পাঠানো চিঠির কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।······

লাহোর বোর্স্টাল জেলে আটক কিরণচন্দ্র দাস ও আরো আটজনকে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতকড়া পরিয়ে শৃংখলাবদ্ধ করে নেওয়া হয়। অথচ পাঞ্জাব জেল এনকোয়ারি কমিটি সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে ড. আলম ও লালা দুনিচাঁদ'এর বিবৃতি 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই সব ঘটনা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর আরও নানা নির্যাতনের কাহিনী যদিও আমাদের অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করেছে তবু শীগগিরই এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে ভেবে আমরা ধর্মঘট থেকে বিরত হই। কিন্তু তবু এই নির্যাতন চলতে থাকায় আমরা কি ভাববো যে অনশন ধর্মঘটীদের প্রচণ্ড যন্ত্রণাভোগ এবং যতীন্দ্রনাথ দাস'এর আত্মত্যাগও বিফলে গেল? আমরা কি ভাববো যে, সাধারণের উত্তেজনা প্রশমিত করতেই শুধু গভর্নমেণ্ট কতকগুলি অলীক আশ্বাস দিয়েছিলেন?······

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণ এবং শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে অনেক কথাই বলা হয়েছে। শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আবার কিছু বলতে চাই। কারণ আমরা দেখছি শ্রেণীবিভাগের সময় 'উদ্দেশ্য' কথাটার ওপর কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। সাধারণ একজন দস্যু ও হত্যাকারীর সংগে একজন রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাজের উদ্দেশ্যকে মিলিয়ে দেওয়া তামাশাজনক ব্যাপার······জেল এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে এ সম্বন্ধে (শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে) দুটি জিনিসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—

১. অপরাধের ধরন

২. অপরাধীর সামাজিক মর্যাদা

চৌধুরী আফজল হক রিপোর্টের এই অংশে তাঁর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকার দরুন যারা রিক্ত ও দরিদ্র তাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ কি ভাবে হবে? একথা মেনে নেওয়া যায় যে, বাইরের জীবনের চেয়ে জেল-জীবনে কৃচ্ছ্রতাভোগ কিছু বাড়বেই। কিন্তু তার অর্থ কি তাকে সবকিছু প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে রাখা? ······যাই হোক, এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল, বর্তমান অব্যবস্থা দূর করার জন্য রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ অপরাধীর শ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র করে ধরতে হবে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে দু'টি শ্রেণী করা যায়—১. যারা অহিংস, ২ যারা হিংসাত্মক কর্মে যুক্ত। হিংসাত্মক কাজের মধ্যে কাজের উদ্দেশ্য ও পরিবেশ বিচারের প্রয়োজন আছে।······

আমাদের বিশেষ দাবি হল, কোন রাজনৈতিক বন্দীকেই অমর্যাদাকর এবং পীড়নকর কোন শ্রমের দায়িত্ব দেওয়া হবে না। তাদের সকলকে এক ওয়ার্ডে রাখতে হবে। অন্ততঃ একখানি দৈনিক পত্রিকা পড়বার সুযোগ তাদের দিতে হবে। এবং তাদের নিজেদের অর্থে খাবার ও পোশাক সংগ্রহ করে নেওয়ার অধিকার তাদের দিতে হবে।

আমরা আশা করবো, দেরি না করে গভর্নমেণ্ট তার দেয় প্রতিশ্রুতি-গুলি পালনের ব্যবস্থা করবে। যদি আগামী সাতদিনের মধ্যে গভর্নমেণ্ট-এর তরফ থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগলি পূরণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তা'হলে আমরা আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করতে বাধ্য হব।

তারিখ: ২৮. ১. ১৯৩০.

ভগৎ সিংহ
বটুকেশ্বর দত্ত

৬. মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী সর্দার ভগৎ সিং, শুকদেব ও শিবরাম রাজগুরু পাঞ্জাবের গভর্নরকে একটি চিঠি দেন—তাঁদের শেষ চিঠি।

লাহোর মামলায় অভিযুক্তদের দ্রুতবিচারের জন্য ভারতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ভাইসরয় বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করে যে ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত করেছেন, সেই ট্রাইবুন্যাল অর্থাৎ ইংরেজের আদালত ১৯৩০'এর ৭ই অক্টোবর তারিখে ঘোষণা করেছে আমাদের ফাঁসীর হুকুম। আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ইংল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই বিচারে দু'টি জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—প্রথম, ব্রিটিশ

সাম্রাজ্য ও ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান। দ্বিতীয়, আমরা সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বন্দী হয়েছি। আমাদের এইভাবে বর্ণনা করায় আমরা গর্বিত।

এই ব্যাপারে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই। যুদ্ধ অর্থে আদালত কি বুঝেছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা এর অন্তর্নিহিত অর্থকে স্বীকার করি। আমাদের এই চিন্তাধারাকে আমরা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে চাই।

যুদ্ধাবস্থা বর্তমান

আমরা একথাই বলতে চাই যে, মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক যতদিন শক্তির জোরে শ্রমজীবী মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করে নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে চাইবে, ততদিন এই যুদ্ধ চলবে। ভারতীয় হোক বা বিদেশাগত হোক, তারা নিজেদের মধ্যে রফা করে গরীবের রক্ত শোষণের কাজে হাত মিলিয়েছে। বর্তমান সরকার ও সেই সব নেতা যারা কিছু সুবিধার বিনিময়ে সরকারের সংগে সহযোগিতা করছে, তাদের কাজে কিছুই যেত আসতো না। কিন্তু সাধারণ মানুষের ওপর ওই নেতাদের অসীম প্রভাব। যুবসমাজের প্রতিও তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, দরিদ্র মানুষের কথা ভুলে গিয়েছেন এবং ভুলে গিয়েছেন তাদের, যারা বিপ্লব সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। এই রাজনীতিবিদ নেতাদের বিশ্বাস আমরা, যারা বিপ্লববাদী, তারা হিংসাত্মক কার্যের অনুগামী……

যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন রূপ

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে। কখনো তার রূপ প্রকট হয়ে ওঠে, আবার কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে। কখনো মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ আন্দোলনের রূপ নেয়, কখনো আবার প্রচণ্ড ও ভয়ংকর হয়ে ওঠে তার প্রকাশ। যে ভাবেই তার প্রকাশ হোক, তার প্রভাব মানুষের ওপরে পড়বেই। এই যুদ্ধ চালিত হবে অসীম প্রত্যয় ও দৃঢ়তার দ্বারা। এর অবসান হবে না যতক্ষণ সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হবে এবং বর্তমান সমাজ এক নতুন সমাজে রূপান্তরিত না হবে।…

শেষ যুদ্ধ

খুব শীগগিরই শেষ যুদ্ধের দুন্দুভি বাজবে, এবং তার মধ্যেই শেষ মীমাংসাও হয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে বিদায় নিতে হবেই।

যতদিন সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হয়, ততদিন এই যুদ্ধ চলতে থাকবে নিত্য নূতন উদ্যম এবং অভেদ্য দৃঢ়তায়। এই যুদ্ধ আমাদের নিয়ে আরম্ভ হয়নি, আর আমাদের মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমাদের আত্মদান সংগ্রামের একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে উত্তরণের পথে সেতু হয়ে থাকবে।

এবার বলবো আমাদের কথা। আমরা জানি আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য আপনাদের উদ্যমের শেষ নেই। আমরা কোন প্রার্থনা রাখতে আসিনি এবং প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতেও চাই না। কিন্তু ব্রিটিশ আদালতের বিচারে আমরা যুদ্ধাপরাধী। আমরা চাই যে, আমাদের যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়া হোক। ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে সেনাবাহিনীর বন্দুকের গুলিতে আমাদের মারার হুকুম দেওয়া হোক—এইটুকুই আমাদের দাবি। ধন্যবাদ।

চ. ছোট ভাই কুলতারকে ভগৎ সিং-এর চিঠি

(তাঁর জীবনের শেষ চিঠি)

মার্চ ৩, ১৯৩১

আমার স্নেহের কুলতার

আজ তোমার চোখে জল দেখে আমি যে কত ব্যথা পেয়েছি তা বলবার নয়। তোমার গলায় কান্না আর চোখে জল আমি যে সহ্য করতে পারি না। ভাই, সাহসে বুক বেঁধে সামনে তাকাও, পড়াশোনা করে যাও।

ভেঙে পোড়ো না ভাই। আমি আর কি লিখবো, কি বলবো? জানো তো

'নির্যাতনের নতুন নতুন পথ বার করতেই
ওরা সারাক্ষণ খোঁজাখুঁজি করছে।'

আমরাও দেখতে চাই ওরা কতদূর যেতে পারে। পৃথিবীর ওপর আমরা রাগ করবো কেন? কেন অভিযোগ তুলবো?

আমাদের আলাদা জগৎ
আমাদেরই জয় করতে হবে।

আমি প্রভাতের দীপশিখা, এবার নিভে যাবার কালে পৌঁছেছি। বিদায়!

পরিশিষ্ট—৩

ক. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (১)– ১৯৩০

অভিযুক্তদের নাম

সর্দার ভগৎ সিং—(ওরফে বলবন্ত সিং)	জন্ম : ৫ই অক্টোবর ১৯০৭, বংগা, লায়ালপুর। ২৩শে মার্চ ১৯৩১ লাহোর জেলে ফাঁসি।
শুকদেব—(দলের নাম : দয়াল, স্বামী ভিলেজার)	জন্ম : সম্বত ১৯৬২, লায়ালপুর। ২৩শে মার্চ ১৯৩১ লাহোর জেলে ফাঁসি।
শিবরাম রাজগুরু—(দলের নাম : এম. রামগুরু, রঘুনাথ)	জন্ম : ১৯০৯, খেরা, পুনা। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ পুনাতে গ্রেপ্তার হন। ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ লাহোর জেলে ফাঁসি।
বিজয়কুমার সিংহ—(ওরফে বাচ্চু)	কানপুর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বর্তমানে ইনি হায়দরাবাদে বাস করেন। 'দি নিউ ম্যান ইন সোভিয়েট ইউনিয়ন' বইটি এঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে। এঁর লেখা আর একটি বই 'The Andamans—The Indian Bastille.' বড় ভাই রাজকুমার সিংহ কাকোরি মামলায় ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।
ঠাকুর মহাবীর সিং—(অন্য নাম পর্তব)	জন্ম : সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, শাহপুর টহলা (এটা)। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৩ সালের ১৭ই মে।
শিব বর্মা—(দলের নাম : পর্বত, হরনারায়ণ, রাম-নারায়ণ কাপুর)	হরদই। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বর্তমানে লক্ষ্ণৌতে বাস করেন। তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হন, তাঁদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন 'সংস্মৃতিয়াং' গ্রন্থে।
জয়দেব—(অন্য নাম : হরিশ্চন্দর)	হরদই। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

গয়াপ্রসাদ—(অন্যান্য নাম ঃ ডা. বি.এস. নিগম, রামলাল, রামনাথ, দেশভগৎ)	জন্ম ঃ জগদীশপুর, কানপুর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।
কিশোরীলাল রত্তন—(দলের নাম ঃ দেওদত্ত, মস্তরাম শাস্ত্রী)	হোসিয়ারপুর, পাঞ্জাব। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।
কমলনাথ তেওয়ারী—(অন্য নাম ঃ কানওয়াল নাথ ত্রিবেদী)	বেতিয়া। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।
কুন্দনলাল (বা প্রতাপ)	সাতবৎসর সশ্রম কারাদন্ড।
প্রেমদত্ত (মাস্টার, অমৃতলাল)	পাঁচবৎসর সশ্রম কারাদন্ড। এখনো জীবিত আছেন।

যাঁরা ধরা পড়েননি

চন্দ্রশেখর আজাদ—(দলের নাম ঃ পন্ডিতজী, কুইক সিলভার)	জন্ম ঃ ২৩শে জানুয়ারি, ১৯০৬, ভাবরা, মধ্য-প্রদেশ। আজাদকে পুলিস কখনো ধরতে পারেনি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ এলাহাবাদে আলফ্রেড পার্কে (বর্তমানে আজাদ পার্ক) পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন।
ভগবতীচরণ ভোরা—	জন্ম ঃ জুলাই, ১৯০৪, পাঞ্জাব। ১৯৩০ সালের ২৮শে মে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। স্ত্রী দুর্গা দেবী আজীবন বিপ্লবের কাজে লিপ্ত ছিলেন।
যতীন্দ্রনাথ দাস—(অন্য নাম ঃ রবীন, কালীবাবু)	জন্ম ঃ ১৯০৪ সালের ২৭শে অক্টোবর, কলকাতায়। মৃত্যু ঃ ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর বোর্স্টাল জেলে। ৬৩ দিন অনশনে থেকে মৃত্যুবরণ করেন।
যশপাল—	ধর্মশালা। মামলা চলার সময়ে ধরা পড়েন নি। ধরা পড়েন এলাহাবাদে ২৩. ১. ১৯৩২।

সংগুরু দয়াল অবস্থি—	কানপুর। ধরা পড়েন নি।
কৈলাসপতি— (অন্য নাম ঃ কালীচরণ)	আজমগড় ১৯৩০, অক্টোবরে ধরা পড়েন

যারা রাজসাক্ষী হয়ে যায়

জয়গোপাল— (দলের নাম ঃ হরবনস-লাল, গোপাল ও কিষেণ চাঁদ)	গুজরানওয়ালা, পাঞ্জাব। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভগবান দাস পিস্তলের গুলিতে জয়গোপালকে হত্যার চেষ্টায় আহত করেন বোম্বের জলগাঁও নামক স্থানে।
ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ— (দলের নাম ঃ দাদা)	চম্পারন, বিহার। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ফণী ঘোষকে ১৯৩২ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে বেতিয়ায় ভোজালির আঘাতে হত্যা করেন চন্দ্রমা সিং ও বৈকুণ্ঠ স্কুল। বৈকুণ্ঠ স্কুলের ফাঁসি হয় ১৯৩৪'এর ১৪ই মে। চন্দ্রমা সিং'এর হয় ১২ বছর কারাদণ্ড।
মনমোহন ব্যানার্জী (বা মনোহর)	চম্পারন, বিহার।
ললিতকুমার মুখার্জী—	এলাহাবাদ
হংসরাজ ভোরা— (বা তারলোকচাঁদ)	লাহোর, পাঞ্জাব।
রামশরণ দাস—	কপূরতলা, পাঞ্জাব।

খ. হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মির অন্যান্য সংগ্রামী সদস্য যাঁদের অভিযুক্ত করা হয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (২) ১৯৩০'এর অভিযোগে।[৫২]

ইন্দরপাল—	কাংরা, পাঞ্জাব।	যাবজ্জীবন	দ্বীপান্তর
রূপচাঁদ—	রাউয়ালপিণ্ডি "	"	"
জাহাঙ্গীরলাল	শেখুপুরা "	"	"
গুলাব সিং	রাউয়ালপিণ্ডি "	"	"
কুন্দনলাল—	বেনারস, উ. প্র.	"	"

সশ্রম কারাদণ্ডে যাঁরা দণ্ডিত হন, তাঁদের নাম—

নাথুরাম (রাউয়ালপিণ্ডি), সর্দার সিং (মথুরা), গুরবক্স সিং (গুজরানওয়ালা), ভীম সেন (শেখুপুরা), সুখদেব রাজ (গুরুদাসপুর), সীতারাম (ঝিলাম), কুন্দনলাল (শেখুপুরা), হরিরাম (রাউয়ালপিণ্ডি), গোকুলচাঁদ (শেখুপুরা), কৃষণলাল (ঝিলাম), হরনাম সিং (রাউয়ালপিণ্ডি)

পলাতক বা যাঁদের পুলিস ধরতে পারেনি—

চন্দ্রশেখর আজাদ—	বেনারস। এলাহাবাদে পুলিসের সংগে সংঘর্ষে নিহত।
বিষেণ দাস—	মামলা চলার সময় মৃত্যু হয়।
যশপাল—	১৯৩২ সালের ২৩শে জানুয়ারি মিসেস জাফর আলির (ওরফে সাবিত্রী দেবী) গৃহে ধরা পড়েন। বিচারে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।
হংসরাজ 'ওয়ারলেস'—	দিল্লীতে বড়লাটের ট্রেনের তলায় যে মাইন পাতা হয়, তার পরিকল্পনা হংসরাজের। হায়দরাবাদের (সিন্ধু) কাছে একটি গ্রামে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হংসরাজ দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।
অন্যদের নাম—	লেখরাম, প্রেমনাথ, মুসম্মত প্রকাশ।

তথ্যপঞ্জী

১. সিডিশন কমিটির রিপোর্ট।
২. G. S. Deol—Saheed Bhagat Singh.
৩. Uma Mukhopadhyay—Two Revolutionaries.
৪. Amrita Bazar Patrika, dt. 7.7.1909.
৫. সিডিশন কমিটির রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ১২৮।
৬. —ঐ—
৭. Ramgopal—How India Struggled for Freedom, p. 131.
৮. সিডিশন কমিটির রিপোর্ট।
৯. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০.৫.১৯০৭, পৃঃ ৬।
১০. G. S. Deol—Saheed Bhagat Singh, Page 4.
(ভগৎ সিং-এর ভাগিনেয় জগমোহন সিং গ্রন্থকারকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন—Saheed Arjan Singh hailed from village Khatkar Kalan of Jullunder. His three sons S. Kishan Singh, father of the great martyr, S. Ajit Singh and S. Swaran Singh were born in the village. It was in 1896 that S. Arjan Singh got land in Banga of Lyallpur.)
১১. Govt. of India, Home Deptt., Proceedings of August, 1907 (Also Shaheed Bhagat Singh, by G. S. Deol, Page 7.)
১২. লাহোর, ১৮ই মার্চ, ১৯০৮ 'হিন্দুস্থান' ও 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় প্রকাশিত। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১.৩. ১৯০৮, পৃঃ ৬।
১৩. G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, Page 12.
১৪. Ibid, Page 8.
১৫. সুপ্রকাশ রায়—ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২৬৯-৭০।
১৬. Report of the Sedition Committee, Para 14.
১৭. Gulab Singh—Under the Shadows of Gallows, Page 9.
১৮. G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, Page 11-12.
১৯. সিডিশন কমিটির রিপোর্ট।
২০. G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, Page 13.

২১. হান্টার কমিশনের (The Punjab Disorders Enquiry Committee) কাছে প্রদত্ত বিবৃতির অংশবিশেষ।

২২. ডায়ারের কাজের পুরস্কারস্বরূপ ২৬০০ পাউন্ডের একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়।

২৩. G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, Page 16.

২৪. কাকোরি মামলার পুলিস রিপোর্টে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

২৫. প্রথম নাতি 'জগৎ' মাত্র এগারো বছর বয়সে মারা যায়।

২৬. In Search of Freedom, Page 220—1.

২৭. এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পুলিস রিপোর্টে পাওয়া গেছে—File No. 375/25, Pol., 1925 ; পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২৮. Jogesh Chandra Chatterjee ; In Search of Freedom, Page 230.

২৯. Ibid, Page 311.

৩০. Statement of Shiv Verma, dt. 14.4.1907.

৩১. Jogesh ch. Chatterjee, In Search of freedom, Page 441.

৩২. Govt. of India, Home Deptt., Political file No. 130 ; G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, Page 24.

৩৩. উল্টোরথ, অগ্নিযুগ সংখ্যা, পৃঃ ৪১।

৩৪. The Dreamland, by Lala Ramsaran Das.

৩৫. G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, Page 32.

৩৬. বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন—অমর শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ, পৃঃ ১১৪।

৩৭. G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, Page 35/36.

৩৮. বিপ্লবীরা তখনও জানতেন না যে, তাঁরা খুন করেছেন স্যান্ডার্স'কে।

৩৯. Govt. of India, Home Deptt., file No. 192 of 1929, Pp. 48 B+C.

৪০. Note by D. Patrick, Director of Intelligence, file No. 192/29—Home/Pol.

৪১. লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', পৃঃ ৮৫-৮৬।

৪২. বর্তমান লেখকের 'শহীদ যতীনদাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন', পৃঃ ২১ ও ২৬।

৪৩. —ঐ—, পৃঃ ৩৯।

৪৪. Dr. B. B. Majumder—Militant Nationalism in India, Page 104.

৪৫. ত্রিভঙ্গ রায়—অগ্নিযুগ স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব।

৪৬. Home Deptt., file No. 192 of 1929, Page 48 B+C.

৪৭. মুজাফ্ফর আহ্মদ—অগ্নিযুগ সংখ্যা উল্টোরথ, পৃঃ ৪৪।

৪৮. "Shortly before the day of outrage Bhagat Singh wrote a sort of farewell letter to Sukhdev, then in Lahore, which was found in the Lahore Bomb factory"—D. Patrick—file No. 192/29, Home/Pol., চিঠির অনুলিপি প্রফেসর জগমোহন সিং (লুধিয়ানা) 'এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৪৯. Terrorim in India 1917-1936, Compiled in the Intelligence Bureau, Home Deptt., Govt. of India.

৫০. বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। তিনজনই ছিলেন সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে।

৫১. বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন—অমর শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ, পৃঃ ২২৩।

৫২. —ঐ—, পৃঃ ২৫৭—৮।

৫৩. G. S. Deol—Shaheed Bhagat Singh, P. 87.

৫৪. Ibid, P. 88.

৫৫. Terrorism in India, 1917—1936, Page 69.

৫৬. Ibid, Page 191.

৫৭. Home Deptt., Political file No. 21/63, 1929.

৫৮. এই বিতর্কে আরও যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মদনমোহন মালব্য, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, Mr. G. L. Winterbotham.

৫৯. Terrorism in india, 1917—1936, Home Deptt , Govt. of India

অনুক্রমণিকা